সাহিত্য সম্ভার

বাংলা (দ্বিতীয় ভাষা)

নবম শ্রেণি

এই পুস্তকটি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আর্থিক আনুকূল্যে
কেবলমাত্র সরকারি, সরকার পোষিত ও সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত
বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের বিনামূল্যে বিতরণের জন্য।

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর, ২০১৪

গ্রন্থস্বত্ব : পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

প্রকাশক :
অধ্যাপিকা নবনীতা চ্যাটার্জি
সচিব, পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ
৭৭/২ পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১৬

মুদ্রক :
ওয়েস্ট বেঙ্গল টেক্সট বুক কর্পোরেশন
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগ)
কলকাতা-৭০০ ০৫৬

सत्यमेव जयते

ভারতের সংবিধান

প্রস্তাবনা

আমরা, ভারতের জনগণ, ভারতকে একটি সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্ররূপে গড়ে তুলতে সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে শপথগ্রহণ করছি এবং তার সকল নাগরিক যাতে : সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক **ন্যায়বিচার**; চিন্তা, মতপ্রকাশ, বিশ্বাস, ধর্ম এবং উপাসনার **স্বাধীনতা**; সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জন ও সুযোগের **সমতা** প্রতিষ্ঠা করতে পারে এবং তাদের সকলের মধ্যে ব্যক্তিসম্ভ্রম ও জাতীয় ঐক্য এবং সংহতি সুনিশ্চিত করে **সৌভ্রাতৃত্ব** গড়ে তুলতে; **আমাদের গণপরিষদে**, আজ, ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর, **এতদ্দ্বারা এই সংবিধান গ্রহণ করছি, বিধিবদ্ধ করছি** এবং **নিজেদের অর্পণ করছি**।

The Constitution of India

PREAMBLE

WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC and to secure to all its citizens : JUSTICE, social, economic and political; LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship; EQUALITY of status and of opportunity and to promote among them all – FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the Nation; IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY this twenty-sixth day of November 1949, do HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION.

ভূমিকা

নবম শ্রেণির জন্য নতুন পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি অনুযায়ী বাংলা সাহিত্যের বই 'সাহিত্য সম্ভার' প্রকাশ করা হলো। বাংলা ভাষাসাহিত্য পাঠ যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেকথা সকলেই স্বীকার করেন। ছাত্রছাত্রীদের সামনে সহজ ও আকর্ষণীয় করে তুলে ধরার মধ্যেই বিষয়ের সার্থকতা। বিভিন্ন ধরনের সাহিত্যসৃষ্টিকে একত্রিত করা হয়েছে 'সাহিত্য সম্ভার' বইটিতে। বইটি তাই বৈচিত্র্যের পরিচায়ক। ২০১১ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক গঠিত একটি 'বিশেষজ্ঞ কমিটি'-কে বিদ্যালয়স্তরের পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তকগুলির সমীক্ষা ও পুনর্বিবেচনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। তাঁদের ঐকান্তিক চেষ্টায়, নিরলস শ্রমে পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি অনুযায়ী 'সাহিত্য সম্ভার' বইটি তৈরি করা সম্ভব হয়েছে।

ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে প্রেরণা জোগাতে বাংলা বিষয়টিকে সহজ ও আকর্ষণীয় করার লক্ষ্যে যথোপযুক্ত মানসম্পন্ন বইয়ের প্রয়োজন ছিল। এই বইটিতে তথ্যের ভার যাতে সাহিত্যের প্রকাশ-ক্ষমতাকে কোনোভাবেই খর্ব না করে সেই দিকে লক্ষ রাখা হয়েছে। পাঠক্রমের মূল বিষয়গুলি সঠিকভাবে অনুধাবন করতে যাতে ছাত্রছাত্রীদের সুবিধা হয় তার জন্য বইটিকে যথাসম্ভব প্রাঞ্জলভাবে আকর্ষণীয় করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। এই বইটির একটিই উদ্দেশ্য, ছাত্রছাত্রীদের কল্পনাশক্তি বিকশিত করা এবং লেখার ক্ষমতাকে উৎসাহিত করা।

এ প্রসঙ্গে আরো একটি তথ্য উল্লেখযোগ্য। বাংলা (দ্বিতীয় ভাষা) পাঠ্যপুস্তকটির সঙ্গে নতুন পাঠক্রম অনুযায়ী লিখিত একটি ব্যাকরণ গ্রন্থও শিক্ষার্থীদের পড়তে হবে।

বিভিন্ন শিক্ষাবিদ, শিক্ষক-শিক্ষিকা, বিষয় বিশেষজ্ঞ, সমাজের বিভিন্ন স্তরের শিক্ষাপ্রেমী মানুষ ও অলংকরণের জন্য খ্যাতনামা শিল্পীবৃন্দ—যাঁদের নিরন্তর শ্রম ও নিরলস চেষ্টার ফলে এই গুরুত্বপূর্ণ বইটির নির্মাণ সম্ভব হয়েছে, তাঁদের সকলকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রাথমিক ও উচ্চপ্রাথমিক স্তরের সমস্ত বিষয়ের বই ছাপিয়ে ছাত্রছাত্রীদের বিনামূল্যে বিতরণ করে থাকে। এই প্রকল্প রূপায়ণে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ড. পার্থ চ্যাটার্জী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যালয় শিক্ষা অধিকার এবং পশ্চিমবঙ্গ সর্বশিক্ষা মিশন নানাভাবে সহায়তা করেন এবং এঁদের ভূমিকাও অনস্বীকার্য।

'সাহিত্য সম্ভার' বইটির উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্য সকলকে মতামত ও পরামর্শ জানাতে আহ্বান করছি।

কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়

ডিসেম্বর, ২০১৪
৭৭/২ পার্ক স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০১৬

প্রশাসক
পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

প্রাক্‌কথন

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১১ সালে বিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি 'বিশেষজ্ঞ কমিটি' গঠন করেন। এই বিশেষজ্ঞ কমিটির ওপর দায়িত্ব ছিল বিদ্যালয়ের স্তরের সমস্ত পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তকের পর্যালোচনা, পুনর্বিবেচনা এবং পুনর্বিন্যাসের প্রক্রিয়া পরিচালনা করা। সেই কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী নতুন পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তক নির্মিত হলো। ইতোপূর্বে প্রাক্-প্রাথমিক থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত সমস্ত পাঠ্যপুস্তক জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা ২০০৫ এবং শিক্ষার অধিকার আইন ২০০৯ নথিদুটিকে অনুসরণ করে নির্মিত হয়েছে। এবার নবম শ্রেণির নতুন পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি অনুযায়ী পাঠ্যপুস্তকগুলি নির্মিত হলো।

নবম শ্রেণির বাংলা দ্বিতীয় ভাষার নির্ধারিত পাঠ্যপুস্তক 'সাহিত্য সম্ভার'। বইটিতে বাংলার প্রখ্যাত, অগ্রগণ্য সাহিত্যিকদের রচনা সংকলিত হলো। দ্বিতীয় ভাষার শিক্ষার্থীদের সামর্থ্য অনুযায়ী রচনাগুলিকে নির্বাচন করা হয়েছে। আমরা আশা করি, বাংলা দ্বিতীয় ভাষার পাঠ্যপুস্তক 'সাহিত্য সম্ভার' শিক্ষার্থীদের কাছে বিশেষ আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে।

'সাহিত্য সম্ভার' বইটিকে রঙে-রেখায় অপূর্ব সৌন্দর্যে অলংকৃত করে দিয়েছেন বিশিষ্ট শিল্পী শ্রী যুধাজিৎ সেনগুপ্ত। তাঁকে ধন্যবাদ জানাই। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, এই পাঠ্যপুস্তকটির পাশাপাশি নতুন পাঠক্রম অনুযায়ী লিখিত একটি ব্যাকরণ গ্রন্থও শিক্ষার্থীদের পড়া আবশ্যক।

নির্বাচিত শিক্ষাবিদ, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং বিষয়-বিশেষজ্ঞবৃন্দ অল্প সময়ের মধ্যে বইটি প্রস্তুত করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক শিক্ষার সারস্বত নিয়ামক পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পাঠ্যপুস্তকটিকে অনুমোদন করে আমাদের বাধিত করেছেন। বিভিন্ন সময়ে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সর্বশিক্ষা মিশন, পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার প্রভূত সহায়তা প্রদান করেছেন। তাঁদের ধন্যবাদ।

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ড. পার্থ চ্যাটার্জী প্রয়োজনীয় মতামত এবং পরামর্শ দিয়ে আমাদের বাধিত করেছেন। তাঁকে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাই।

বইটির উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্য শিক্ষাপ্রেমী মানুষের মতামত, পরামর্শ আমরা সাদরে গ্রহণ করব।

অভীক মজুমদার
চেয়ারম্যান
'বিশেষজ্ঞ কমিটি'
বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

ডিসেম্বর, ২০১৪
নিবেদিতা ভবন, ষষ্ঠতল
বিধাননগর, কলকাতা : ৭০০ ০৯১

বিশেষজ্ঞ কমিটি পরিচালিত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন পর্ষদ

সদস্য

অভীক মজুমদার (চেয়ারম্যান, বিশেষজ্ঞ কমিটি) রথীন্দ্রনাথ দে (সদস্য-সচিব, বিশেষজ্ঞ কমিটি)

নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী

ঋত্বিক মল্লিক সৌম্যসুন্দর মুখোপাধ্যায় রুদ্রশেখর সাহা মিথুন নারায়ণ বসু

অপূর্ব সাহা স্বাতী চক্রবর্তী ইলোরা ঘোষ মির্জা

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ

যুধাজিৎ সেনগুপ্ত

পুস্তক নির্মাণ

বিপ্লব মণ্ডল

সূচিপত্র

কবিতা

• বীরবাহুর মৃত্যুতে রাবণ — মাইকেল মধুসূদন দত্ত ৩
জ্যোতি — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৫
• নগরলক্ষ্মী — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৬
• ধনধান্যপুষ্পভরা — দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ৯
কাজলাদিদি — যতীন্দ্রমোহন বাগচী ১১
• ডাকটিকিট — সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ১৩
• ঈশ্বর — কাজী নজরুল ইসলাম ১৪
এখানে আকাশ নীল — জীবনানন্দ দাশ ১৫
মধুমতী নদী দিয়া — জসীমউদ্দীন ১৬
ইলিশ — বুদ্ধদেব বসু ১৭
• জননী জন্মভূমি — সুভাষ মুখোপাধ্যায় ১৮

গদ্য

• বাঙ্গালার ইতিহাস — ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ২৩
গগন-পটো — অক্ষয়চন্দ্র সরকার ২৬
কঙ্কাবতী — ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় ৩০
• পোস্টমাস্টার — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৩৪
যাত্রা — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৩৯
• অধ্যয়ন ও জ্ঞানলাভ — প্রফুল্লচন্দ্র রায় ৪৩
• ইন্দ্রনাথ ও শ্রীকান্ত — শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৪৭
ঠেলাগাড়ি — বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৪
সভাকবি — শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ৫৯
• চিল্কা — সৈয়দ মজুতবা আলী ৬২
পটোদিদি — লীলা মজুমদার ৬৮
• আমার ছোটোবেলা — আশাপূর্ণা দেবী ৭১

অনুবাদ সাহিত্য

• শামুক — অনুপমা বসুমাতরি ৭৭
• বাজি — আন্তন চেকভ ৭৮

নাটক

• প্রতাপাদিত্য — ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ ৮৭

লেখক পরিচিতি ৯৩

প্রশ্নের কাঠামো ও নমুনা ৯৮

[•] চিহ্নিত পাঠগুলি পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত

কবিতা

বীরবাহুর মৃত্যুতে রাবণ

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

মহাশোকে শোকাকুল কহিলা রাবণ;—
"যে শয্যায় আজি তুমি শুয়েছ, কুমার
প্রিয়তম, বীরকুলসাধ এ শয়নে
সদা! রিপুদলবলে দলিয়া সমরে,
জন্মভূমি-রক্ষাহেতু কে ডরে মরিতে?
যে ডরে, ভীরু সে মূঢ়; শত ধিক্ তারে!
তবু, বৎস, যে হৃদয়, মুগ্ধ মোহমদে
কোমল সে ফুল-সম। এ বজ্র-আঘাতে,
কত যে কাতর সে, তা জানেন সে জন,
অন্তর্যামী যিনি; আমি কহিতে অক্ষম।
হে বিধি, এ ভবভূমি তব লীলাস্থলী;—
পরের যাতনা কিন্তু দেখি কি হে তুমি
হও সুখী? পিতা সদা পুত্রদুঃখে দুঃখী—
তুমি হে জগৎ-পিতা, এ কি রীতি তব?
হা পুত্র! হা বীরবাহু! বীরেন্দ্র-কেশরী!
কেমনে ধরিব প্রাণ তোমার বিহনে?"
এইরূপে আক্ষেপিয়া রাক্ষস-ঈশ্বর
রাবণ, ফিরায়ে আঁখি, দেখিলেন দূরে
সাগর-মকরালয়। মেঘশ্রেণি যেন
অচল, ভাসিছে জলে শিলাকুল, বাঁধা

দৃঢ় বাঁধে। দুই পাশে তরঙ্গ-নিচয়,
ফেণাময়, ফণাময় যথা ফণিবর,
উথলিছে নিরন্তর গম্ভীর নির্ঘোষে।
অপূর্ব-বন্ধন সেতু; রাজপথ-সম
প্রশস্ত; বহিছে জলস্রোতঃ কলরবে,
স্রোতঃ-পথে জল যথা বরিষার কালে।
অভিমানে মহামানী বীরকুলর্ষভ
রাবণ, কহিলা বলী সিন্ধু পানে চাহি;—
"কী সুন্দর মালা আজি পরিয়াছ গলে,
প্রচেতঃ! হা ধিক্, ওহে জলদলপতি!
এই কি সাজে তোমারে, অলঙ্ঘ্য, অজেয়
তুমি? হায়, এই কি হে তোমার ভূষণ,
রত্নাকর? কোন্ গুণে, কহ দেব, শুনি,
কোন্ গুণে দাশরথি কিনেছে তোমারে?
প্রভঞ্জন বৈরী তুমি; প্রভঞ্জন-সম
ভীম পরাক্রমে! কহ, এ নিগড় তবে
পর তুমি কোন্ পাপে? অধম ভালুকে
শৃঙ্খলিয়া জাদুকর, খেলে তারে লয়ে;
কেশরীর রাজপদ কার সাধ্য বাঁধে
বীতংসে? এই যে লঙ্কা, হৈমবতী পুরী,
শোভে তব বক্ষঃস্থলে, হে নীলাম্বুস্বামি,
কৌস্তুভ-রতন যথা মাধবের বুকে,
কেন হে নির্দয় এবে তুমি এর প্রতি?
উঠ, বলি; বীরবলে এ জাঙাল ভাঙি,
দূর কর অপবাদ; জুড়াও এ জ্বালা,
ডুবায়ে অতল জলে এ প্রবল রিপু।
রেখো না গো তব ভালে এ কলঙ্ক-রেখা,
হে বারীন্দ্র, তব পদে এ মম মিনতি।"

জ্যোতি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এসো দুঃসহ, এসো এসো নির্দয়—
তোমারি হউক জয়।
এসো নির্মল, এসো এসো নির্ভয়—
তোমারি হউক জয়।
প্রভাতসূর্য, এসেছ রুদ্রসাজে,
দুঃখের পথে তোমার তূর্য বাজে,
অরুণবহ্নি জ্বালাও চিত্ত-মাঝে—
মৃত্যুর হোক লয়।
তোমারি হউক জয়।।

ভেঙেছ দুয়ার এসেছ জ্যোতির্ময়—
তোমারি হউক জয়।
তিমিরবিদার উদার অভ্যুদয়,
তোমারি হউক জয়।
হে বিজয়ী বীর, নবজীবনের প্রাতে
নবীন আশার খড়্গ তোমার হাতে,
জীর্ণ আবেশ কাটো সুকঠোর ঘাতে—
বন্ধন হোক ক্ষয়।
তোমারি হউক জয়।

নগরলক্ষ্মী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দুর্ভিক্ষ শ্রাবস্তীপুরে যবে
জাগিয়া উঠিল হাহারবে
বুদ্ধ নিজ ভক্তগণে শুধালেন জনে জনে
"ক্ষুধিতেরে অন্নদান-সেবা
তোমরা লইবে বল কেবা?"

শুনি তাহা রত্নাকর শেঠ
করিয়া রহিল মাথা হেঁট।
কহিল সে কর জুড়ি' "ক্ষুধার্ত বিশাল পুরী,
এ ক্ষুধা মিটাইব আমি—
এমন ক্ষমতা নাই, স্বামী!"

কহিল সামন্ত জয়সেন,
"যে আদেশ প্রভু করিছেন
তাহা লইতাম শিরে যদি মোর বুক চিরে
রক্ত দিলে হ'ত কোনো কাজ—
মোর ঘরে অন্ন কোথা আজ।"

নিঃশ্বাসিয়া কহে ধর্মপাল,
"কী কব, এমন দগ্ধ ভাল—
আমার সোনার ক্ষেত শুষিছে অজন্মা-প্রেত,
রাজকর জোগানো কঠিন।
হয়েছি অক্ষম দীনহীন।"

রহে সবে মুখে মুখে চাহি,
কাহারো উত্তর কিছু নাহি।
নির্বাক্ সে সভাঘরে ব্যথিত নগরী-'পরে
বুদ্ধের করুণ আঁখি দুটি
সন্ধ্যাতারাসম রহে ফুটি।

তখন উঠিল ধীরে ধীরে
রক্তভাল লাজনম্রশিরে
অনাথপিণ্ডদসুতা বেদনায় অশ্রুপ্লুতা
বুদ্ধের চরণরেণু লয়ে,
মধুকণ্ঠে কহিল বিনয়ে—

"ভিক্ষুণীর অধম সুপ্রিয়া
তব আজ্ঞা লইল বহিয়া
কাঁদে যারা খাদ্যহারা আমার সন্তান তারা
নগরীকে অন্ন বিলাবার
আমি আজি লইলাম ভার।"

বিস্ময় মানিল সবে শুনি—
"ভিক্ষুকন্যা তুমি যে ভিক্ষুণী,
কোন্ অহংকারে মাতি লইলে মস্তক পাতি
এ-হেন কঠিন গুরু কাজ
কী আছে তোমার কহো আজ।"

কহিল সে নমি' সবা-কাছে,
"শুধু এই ভিক্ষাপাত্র আছে।
আমি দীনহীন মেয়ে অক্ষম সবার চেয়ে,
তাই তোমাদের পাব দয়া—
প্রভু-আজ্ঞা হইবে বিজয়া।"

"আমার ভাণ্ডার আছে ভ'রে
তোমা-সবাকার ঘরে ঘরে।
তোমরা চাহিলে সবে এ পাত্র অক্ষয় হবে,
ভিক্ষা-অন্নে বাঁচাব বসুধা
মিটাইব দুর্ভিক্ষের ক্ষুধা।"

ধনধান্যপুষ্পভরা

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

ধনধান্যপুষ্পভরা আমাদের এই বসুন্ধরা,
তাহার মাঝে আছে দেশ এক সকল দেশের সেরা;
(ও সে) স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে দেশ, স্মৃতি দিয়ে ঘেরা;
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি,
সকল দেশের রানি সে যে আমার জন্মভূমি।
চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-তারা কোথায় উজল এমনধারা!
কোথায় এমন খেলে তড়িৎ এমন কালো মেঘে!
তার পাখির ডাকে ঘুমিয়ে উঠি, পাখির ডাকে জেগে;

এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি,
সকল দেশের রানি সে যে আমার জন্মভূমি।
এত স্নিগ্ধ নদী কাহার, কোথায় এমন ধূম্র পাহাড়!
কোথায় এমন হরিৎক্ষেত্র আকাশতলে মেশে!
এমন ধানের উপর ঢেউ খেলে যায় বাতাস কাহার দেশে!
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি,
সকল দেশের রানি সে যে আমার জন্মভূমি!
পুষ্পে পুষ্পে ভরা শাখী, কুঞ্জে কুঞ্জে গাহে পাখি,
গুঞ্জরিয়া আসে অলি পুঞ্জে পুঞ্জে ধেয়ে—
তারা, ফুলের উপর ঘুমিয়ে পড়ে ফুলের মধু খেয়ে;
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি,
সকল দেশের রানি সে যে আমার জন্মভূমি।
ভায়ের মায়ের এত স্নেহ কোথায় গেলে পাবে কেহ!
ও মা তোমার চরণদুটি বক্ষে আমার ধরি,
আমার এই দেশেতে জন্ম, যেন এই দেশেতেই মরি!
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি,
সকল দেশের রানি সে যে আমার জন্মভূমি।

কাজলা-দিদি

যতীন্দ্রমোহন বাগচী

বাঁশবাগানের মাথার উপর চাঁদ উঠেছে ওই–
মাগো, আমার শোলোক-বলা কাজলা-দিদি কই?
পুকুর ধারে, নেবুর তলে থোকায় থোকায় জোনাই জ্বলে,–
ফুলের গন্ধে ঘুম আসে না, একলা জেগে' রই;
মাগো, আমার কোলের কাছে কাজলা-দিদি কই?

সেদিন হ’তে দিদিকে আর কেনই বা না ডাকো,
দিদির কথায় আঁচল দিয়ে মুখটি কেন ঢাকো?
খাবার খেতে আমি যখন   দিদি বলে ডাকি, তখন
ও-ঘর থেকে কেন মা আর দিদি আসে নাকো,
আমি ডাকি, – তুমি কেন চুপটি করে থাকো?

বল মা দিদি কোথায় গেছে, আসবে আবার কবে?
কাল যে আমার নতুন ঘরে পুতুল-বিয়ে হবে!
দিদির মতন ফাঁকি দিয়ে   আমিও যদি লুকোই গিয়ে–
তুমি তখন একলা ঘরে কেমন করে রবে?
আমিও নাই দিদিও নাই – কেমন মজা হবে!

ভুঁইচাঁপাতে ভরে গেছে শিউলি গাছের তল,
মাড়াস নে মা পুকুর থেকে আনবি যখন জল;
ডালিম গাছের ডালের ফাঁকে   বুলবুলিটি লুকিয়ে থাকে,
দিস নে তারে উড়িয়ে মাগো, ছিঁড়তে গিয়ে ফল;
দিদি এসে শুনবে যখন, বলবি কী মা বল!

বাঁশবাগানের মাথার উপর চাঁদ উঠেছে ওই –
এমন সময়, মাগো, আমার কাজলা-দিদি কই?
বেড়ার ধারে, পুকুর পাড়ে   ঝিঁঝি ডাকে ঝোপে-ঝাড়ে;
নেবুর গন্ধে ঘুম আসে না – তাইতে জেগে রই;–
রাত হলো যে, মাগো, আমার কাজলা-দিদি কই?

ডাকটিকিট

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

ডাকটিকিটের রাশি—আমি ভালোবাসি,
যদি তা পুরানো হয়—ব্যবহার করা,
ছেঁড়া, কাটা, ছাপমারা স্বদেশি, বিদেশি;—
তা সবে পরশি যেন হাতে পাই ধরা!

যুক্তরাজ্য, চিলি, পেরু, ফিজি দ্বীপ হতে,—
মিশর, সুদান, চিন, পারস্য, জাপান,
তুর্কি, রুশ, ফ্রান্স, গ্রিস হ'তে কত পথে
এসেছে, চড়িয়া তারা কত মতো যান!

কেহ আঁকিয়াছে বুকে—নব সূর্যোদয়,
শান্তি দেবী—কারো বুকে—তুষার পর্বত,
হংস, জেব্রা, বরুণ, শকুনি, সর্পচয়,
কারো বুকে রাজা, কারো মানব মহত,—

যুগ্ম হস্তী, যুগ্ম সিংহ, ড্রাগন ভীষণ,
দীপ্ত সূর্য, সূর্যমুখী, ফিনিক্স, নিশান,
ময়ূর, হরিণ, কপি, বাষ্প জলযান,
দেবদূত, অর্ধচন্দ্র, মুকুট, বিষাণ!

কেহ আনিয়াছে বহি' পিরামিড-কণা!
কেহ বা এসেছে মাখি' পার্থিনন-ধূলি!
নায়েগ্রাগর্জন বিনা কিছু জানিত না,—
এমন ইহার মধ্যে আছে কতগুলি!

কেহ বা এনেছে কারো কুশল সংবাদ—
মাখি' মুখামৃত, বহি' সাগ্রহ চুম্বন!
কেহ বা পেতেছে নব বাণিজ্যের ফাঁদ;
কেহ বা অনাদৃত, কারো আদৃত জীবন!

সকলগুলিই আমি ভালোবাসি, ভাই,
সমগ্র ধরার স্পর্শ পাই এক ঠাঁই!

ঈশ্বর

কাজী নজরুল ইসলাম

কে তুমি খুঁজিছ জগদীশে ভাই আকাশ-পাতাল জুড়ে?
কে তুমি ফিরিছ বনে-জঙ্গলে, কে তুমি পাহাড়-চূড়ে?
হায় ঋষি-দরবেশ,
বুকের মানিকে বুকে ধরে তুমি খোঁজো তারে দেশ-দেশ!
সৃষ্টি রয়েছে তোমা পানে চেয়ে তুমি আছ চোখ বুঁজে,
স্রষ্টারে খোঁজো—আপনারে তুমি আপনি ফিরিছ খুঁজে!
ইচ্ছা-অন্ধ! আঁখি খোলো, দেখো দর্পণে নিজ-কায়া,
দেখিবে, তোমারই সব অবয়বে পড়েছে তাঁহার ছায়া।
শিহরি উঠো না, শাস্ত্রবিদেরে কোরো নাকো বীর ভয়,—
তাহারা খোদার খোদ 'প্রাইভেট সেক্রেটারি' তো নয়!
সকলের মাঝে প্রকাশ তাঁহার, সকলের মাঝে তিনি!
আমারে দেখিয়া আমার অদেখা জন্মদাতারে চিনি!
রত্ন লইয়া বেচা-কেনা করে বণিক সিন্ধু-কূলে—
রত্নাকরের খবর তা বলে পুছো না ওদেরে ভুলে।
উহারা রত্ন-বেনে,
রত্ন চিনিয়া মনে করে ওরা রত্নাকরেও চেনে।
ডুবে নাই তারা অতল গভীর রত্ন-সিন্ধুতলে,
শাস্ত্র না ঘেঁটে ডুব দাও সখা, সত্য-সিন্ধু জলে।

এখানে আকাশ নীল

জীবনানন্দ দাশ

এখানে আকাশ নীল— নীলাভ আকাশ জুড়ে সজিনার ফুল
ফুটে থাকে হিম শাদা— রং তার আশ্বিনের আলোর মতন;
আকন্দফুলের কালো ভীমরুল এইখানে করে গুঞ্জরন
রৌদ্রের দুপুরে ভ'রে;— বার-বার রোদ তার সুচিক্কণ চুল
কাঁঠাল জামের বুকে নিঙড়ায়;— দহে বিলে চঞ্চল আঙুল
বুলায়ে-বুলায়ে ফেরে এইখানে জাম লিচু কাঁঠালের বন,
ধনপতি, শ্রীমন্তের, বেহুলার, লহনার ছুঁয়েছে চরণ;
মেঠো পথে মিশে আছে কাক আর কোকিলের শরীরের ধুল,
কবেকার কোকিলের, জানো কি তা? যখন মুকুন্দরাম, হায়,
লিখিতে ছিলেন ব'সে দু-পহরে সাধের সে চণ্ডিকামঙ্গল,
কোকিলের ডাক শুনে লেখা তাঁর বাধা পায়— থেমে-থেমে যায়;—
অথবা বেহুলা একা যখন চলেছে ভেসে গাঙুড়ের জল
সন্ধ্যার অন্ধকারে, ধানখেতে, আমবনে, অস্পষ্ট শাখায়
কোকিলের ডাক শুনে চোখে তার ফুটে ছিল কুয়াশা কেবল।

মধুমতী নদী দিয়া

জসীমউদ্দীন

বেদের বহর ভাসিয়া চলেছে কূলে ঢেউ আছাড়িয়া।
জলের উপরে ভাসাইয়া তারা ঘরবাড়ি সংসার,
নিজেরাও আজ ভাসিয়া চলেছে সঙ্গ লইয়া তার।
মাটির ছেলেরা অভিমান করে ছাড়িয়া মায়ের কোল,
নাম-হীন কত নদী-তরঙ্গে ফিরিছে খাইয়া দোল।
দুপাশে বাড়ায়ে বাঁকা তট-বাহু সাথে সাথে মাটি ধায়,
চঞ্চল ছেলে আজিও তাহারে ধরা নাহি দিল হায়।
কত বন-পথ সুশীতল-ছায়া ফুল-ফল-ভরা গ্রাম,
শস্যের খেত আলপনা আঁকি ডাকে তারে অবিরাম!
কত ধল-দিঘি, গাজনের হাট, রাঙা মাটি পথে ওড়ে,
কারো মোহে ওরা ফিরিয়া এলে না আবার মাটির ঘরে।
—জলের উপরে ভাসায়ে উহারা ডিঙ্গি নায়ের পাড়া।
নদীতে নদীতে ঘুরিছে ফিরিছে সীমাহীন গতিধারা।
তারি সাথে সাথে ভাসিয়া ফিরিছে সীমাহীন গতিধারা।
তারি সাথে সাথে ভাসিয়া চলেছে প্রেম ভালোবাসা মায়া,
চলেছে ভাসিয়া সোহাগ আদর, ধরিয়া ওদের ছায়া।
জলের উপরে ভাসিয়া চলেছে কোলাহল, মারামারি,
ত্যাগের মহিমা পুণ্যের জয় সঙ্গে চলেছে তারি।

ইলিশ

বুদ্ধদেব বসু

আকাশে আষাঢ় এল; বাংলাদেশ বর্ষায় বিহ্বল।
মেঘবর্ণ মেঘনার তীরে-তীরে নারিকেলসারি
বৃষ্টিতে ধূমল : পদ্মাপ্রান্তে শতাব্দীর রাজবাড়ি
বিলুপ্তির প্রত্যাশায় দৃশ্যপট-সম অচঞ্চল।

মধ্যরাত্রি; মেঘ-ঘন অন্ধকার; দুরন্ত উচ্ছল
আবর্তে কুটিল নদী; তীর-তীব্র বেগে দেয় পাড়ি
ছোটো নৌকাগুলি; প্রাণপণে ফ্যালে জাল, টানে দড়ি
অর্ধ-নগ্ন যারা, তারা খাদ্যহীন, খাদ্যের সম্বল।

রাত্রিশেষে গোয়ালন্দে অন্ধ কালো মালগাড়ি ভরে
জলের উজ্জ্বল শস্য, রাশি-রাশি ইলিশের শব,
নদীর নিবিড়তম উল্লাসের মৃত্যুর পাহাড়।
তারপর কলকাতার বিবর্ণ সকালে ঘরে-ঘরে
ইলিশ ভাজার গন্ধ; কেরানির গিন্নির ভাঁড়ার
সরস সর্ষের ঝাঁজে। এল বর্ষা, ইলিশ-উৎসব।

জননী জন্মভূমি

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

আমি ভীষণ ভালো বাসতাম আমার মা-কে
—কখনও মুখ ফুটে বলিনি।
টিফিনের পয়সা বাঁচিয়ে
কখনো-কখনো কিনে আনতাম কমলালেবু
—শুয়ে শুয়ে মা-র চোখ জলে ভরে উঠত
আমার ভালোবাসার কথা
মা-কে কখনও আমি মুখ ফুটে বলতে পারিনি।

হে দেশ, হে আমার জননী—
কেমন করে তোমাকে আমি বলি।

যে মাটিতে ভর দিয়ে আমি উঠে দাঁড়িয়েছি—
আমার দু-হাতের
দশ আঙুলে
তার স্মৃতি।

আমি যা কিছু স্পর্শ করি
সেখানেই,
হে জননী,
তুমি।
আমার হৃদয়বীণা
তোমারই হাতে বাজে।

হে জননী,
আমরা ভয় পাইনি।
যারা তোমার মাটিতে নিষ্ঠুর থাবা বাড়িয়েছে
আমরা তাদের ঘাড় ধরে
সীমান্ত পার করে দেব।
আমরা জীবনকে নিজের মতো করে
সাজাচ্ছিলাম—
আমরা সাজাতে থাকব।

হে জননী,
আমরা ভয় পাইনি।
যজ্ঞে বিঘ্ন ঘটেছে বলে
আমরা বিরক্ত।

মুখ বন্ধ করে,
অক্লান্ত হাতে—
হে জননী,
আমরা ভালোবাসার কথা বলে যাব।।

গদ্য

বাঙ্গালার ইতিহাস

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

বেলা পাঁচটার সময়, সিরাজউদ্দৌলা, চৌপালায় চড়িয়া, দুর্গ মধ্যে উপস্থিত হইলে, য়ুরোপীয়েরা তাঁহার সম্মুখে নীত হইল। হলওয়েল সাহেবের দুই হস্ত বন্ধ ছিল, নবাব খুলিয়া দিতে আজ্ঞা দিয়া, তাঁহাকে এই বলিয়া আশ্বাস প্রদান করিলেন, তোমার একটি কেশও স্পৃষ্ট হইবেক না; অনন্তর, বিস্ময় প্রকাশপূর্বক কহিলেন, এত অল্প সংখ্যক ব্যক্তি, কীরূপে, চারিশত গুণ অধিক সৈন্যের সহিত এতক্ষণ যুদ্ধ করিল। পরে, এক অনাবৃত প্রদেশে সভা করিয়া, তিনি কৃষ্ণদাসকে সম্মুখে আনিতে আদেশ করিলেন। নবাব যে ইংরেজদিগকে আক্রমণ করেন, কৃষ্ণদাসকে আশ্রয় দেওয়া তাহার এক প্রধান কারণ। তাহাতে সকলে অনুমান করিয়াছিল, তিনি কৃষ্ণদাসের গুরুতর দণ্ড করিবেন; কিন্তু তিনি, তাহা না করিয়া, তাঁহাকে এক মহামূল্য পরিচ্ছদ পুরস্কার দিলেন।

বেলা ছয় সাত ঘণ্টার সময়, নবাব, সেনাপতি মানিকচাঁদের হস্তে দুর্গ সমর্পণ করিয়া, শিবিরে গমন করিলেন। সমুদয়ে এক শত ছচল্লিশ জন য়ুরোপীয় বন্দী ছিল। সেনাপতি সে রাত্রি তাহাদিগকে যেখানে রাখিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন, এমন স্থানের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। তৎকালে দুর্গের মধ্যে, দীর্ঘে বারো হাত, প্রস্থে নয় হাত, এরূপ এক গৃহ ছিল। বায়ুসঞ্চারের নিমিত্ত, ওই গৃহের এক এক দিকে এক এক মাত্র গবাক্ষ থাকে। ইংরেজেরা কলহকারী দুর্বৃত্ত সৈনিকদিগকে ওই গৃহে রুদ্ধ করিয়া রাখিতেন। নবাবের সেনাপতি, দারুণ গ্রীষ্মকালে, সমস্ত য়ুরোপীয় বন্দীদিগকে ওই ক্ষুদ্র গৃহে নিক্ষিপ্ত করিলেন।

সে রাত্রিতে যন্ত্রণার পরিসীমা ছিল না। বন্দীরা, অতি ত্বরায়, ঘোরতর পিপাসায় কাতর হইল। তাহারা, রক্ষকদিগের নিকট বারংবার প্রার্থনা করিয়া যে জল পাইল, তাহাতে কেবল তাহাদিগকে ক্ষিপ্তপ্রায় করিল। প্রত্যেক ব্যক্তি, সম্যকরূপে নিশ্বাস আকর্ষণ করিবার আশায়, গবাক্ষের নিকটে যাইবার নিমিত্ত, বিবাদ করিতে লাগিল; এবং, যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া, রক্ষীদিগের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিল, তোমরা, গুলি করিয়া, আমাদের এই দুঃসহ যন্ত্রণার অবসান করো। এক এক জন করিয়া, ক্রমে ক্রমে, অনেকে পঞ্চত্ব পাইয়া ভূতলশায়ী হইল। অবশিষ্ট ব্যক্তিরা শবরাশির উপর দাঁড়াইয়া, নিশ্বাস আকর্ষণের অনেক স্থান পাইল, এবং তাহাতেই কয়েকজন জীবিত থাকিল।

পরদিন প্রাতঃকালে ওই গৃহের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইলে, দৃষ্ট হইল, এক শত ছচল্লিশের মধ্যে, তেইশ জন মাত্র জীবিত আছে। অন্ধকূপহত্যা নামে যে অতি ভয়ঙ্কর ব্যাপার প্রসিদ্ধ আছে, সে এই। এই হত্যার নিমিত্তই, সিরাজউদ্দৌলার কলিকাতা আক্রমণ শুনিতে এত ভয়ানক হইয়া রহিয়াছে, উক্ত ঘোরতর অত্যাচার প্রযুক্তই, এই বৃত্তান্ত লোকের অন্তঃকরণে অদ্যাপি দেদীপ্যমান আছে, এবং সিরাজউদ্দৌলাও নৃশংস রাক্ষস বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। কিন্তু তিনি, পরদিন প্রাতঃকাল পর্যন্ত, এই ব্যাপারের বিন্দুবিসর্গ জানিতেন না। সে রাত্রিতে, সেনাপতি মানিকচাঁদের হস্তে দুর্গের ভার অর্পিত ছিল; অতএব, তিনিই সমস্ত দোষের ভাগী।

২১ জুন, প্রাতঃকালে, এই নিদারুণ ব্যাপার নবাবের কর্ণগোচর হইলে তিনি অতিশয় অনবধান প্রদর্শন করিলেন। অন্ধকূপে রুদ্ধ হইয়া, যে কয় ব্যক্তি জীবিত থাকে, হলওয়েল সাহেব তাহাদের মধ্যে একজন। নবাব, তাঁহাকে আহ্বান করিয়া ধনাগার দেখাইয়া দিতে কহিলেন। তিনি দেখাইয়া দিলেন; কিন্তু ধনাগারের মধ্যে পঞ্চাশ সহস্রের অধিক টাকা পাওয়া গেল না।

সিরাজউদ্দৌলা, নয় দিবস, কলিকাতার সান্নিধ্যে থাকিলেন; অনন্তর, কলিকাতার নাম আলীনগর রাখিয়া, মুরশিদাবাদ প্রস্থান করিলেন। ২ জুলাই, গঙ্গা পার হইয়া তিনি হুগলীতে উত্তীর্ণ হইলেন, এবং লোক দ্বারা ওলন্দাজ ও ফরাসিদিগের নিকট কিছু কিছু টাকা চাহিয়া পাঠাইলেন। তিনি তাঁহাদিগকে এই বলিয়া ভয় প্রদর্শন করিলেন, যদি অস্বীকার কর, তোমাদেরও ইংরেজদের মত দুরবস্থা করিব। তাহাতে ওলন্দাজেরা সাড়ে চারি লক্ষ, আর ফরাসিরা সাড়ে তিন লক্ষ টাকা দিয়া পরিত্রাণ পাইলেন।

যে বৎসর কলিকাতা পরাজিত হইল, ও ইংরেজেরা বাংলা হইতে দূরীকৃত হইলেন, সেই বৎসর, অর্থাৎ ১৭৫৬ খ্রি. অব্দে, দিনামারেরা, এই দেশে বাসের অনুমতি পাইয়া শ্রীরামপুর নগর সংস্থাপিত করিলেন।

সিরাজউদ্দৌলা, জয়লাভে প্রফুল্ল হইয়া, পূর্ণিয়ার অধিপতি পিতৃব্যপুত্র সকতজঙ্গকে আক্রমণ করা স্থির করিলেন। বিবাদ উত্থাপন করিবার নিমিত্ত, আপন এক ভৃত্যকে ওই প্রদেশের ফৌজদার নিযুক্ত করিয়া, পিতৃব্যপুত্রকে এই আজ্ঞাপত্র লিখিলেন, তুমি অবিলম্বে ইহার হস্তে সমস্ত বিষয়ের ভার দিবে। ওই উদ্ধত যুবা, পত্র পাঠে

ক্রোধান্ধ ও ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া, উত্তর লিখিলেন, আমি সমস্ত প্রদেশের যথার্থ অধিপতি, দিল্লি হইতে সনন্দ পাইয়াছি; অতএব, আজ্ঞা করিতেছি, তুমি অবিলম্বে মুরশিদাবাদ হইতে চলিয়া যাও।

এই উত্তর পাইয়া, সিরাজউদ্দৌলা, ক্রোধে অধৈর্য হইলেন, এবং অতি ত্বরায়, সৈন্য সংগ্রহ করিয়া পূর্ণিয়া যাত্রা করিলেন। সকতজঙ্গও, এই সংবাদ পাইয়া সৈন্য লইয়া, তদভিমুখে আগমন করিতে লাগিলেন। কিন্তু সকতজঙ্গ নিজে যুদ্ধের কিছুই জানিতেন না, এবং কাহারও পরামর্শ শুনিতেন না। তাঁহার সেনাপতিরা সৈন্য সহিত এক দৃঢ় স্থানে উপস্থিত হইল। ওই স্থানের সম্মুখে জলা, পার হইবার নিমিত্ত মধ্যে এক মাত্র সেতু ছিল। সৈন্য সকল সেই স্থানে শিবির সন্নিবেশিত করিল। কিন্তু তদীয় সৈন্য মধ্যে, এক ব্যক্তিও উপযুক্ত সেনাপতি পাটি ছিল না। প্রত্যেক সেনাপতি আপন আপন সুবিধা অনুসারে, পৃথক পৃথক স্থানে সেনাপতি নিবেশিত করিলেন।

সিরাজউদ্দৌলার সৈন্য, ওই জলার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া সকতজঙ্গের সৈন্যের উপর গোলা চালাইতে লাগিল। বড়ো বড়ো কামানের গোলাতে তদীয় সৈন্য ছিন্নভিন্ন হইলে, তিনি নিতান্ত উন্মত্তের ন্যায়, স্বীয় অশ্বারোহীদিগকে, জলা পার হইয়া, বিপক্ষ সৈন্য আক্রমণ করিতে আজ্ঞা দিলেন। তাহারা অতি কষ্টে কর্দম পার হইয়া, শুষ্ক স্থানে উপস্থিত হইবা মাত্র, সিরাজউদ্দৌলার সৈন্য অতি ভয়ানক রূপে তাহাদিগকে আক্রমণ করিল।

ঘোরতর যুদ্ধ হইতেছে, এমন সময়ে, সকতজঙ্গ স্বীয় শিবিরে প্রবেশ করিলেন, এবং, অত্যধিক সুরাপান করিয়া, এমন মত্ত হইলেন যে, আর সোজা হইয়া বসিতে পারেন না। তাঁহার সেনাপতিরা আসিয়া তাঁহাকে, রণস্থলে উপস্থিত থাকিবার নিমিত্ত, অতিশয় অনুরোধ করিতে লাগিলেন; পরিশেষে ধরিয়া থাকিবার নিমিত্ত এক ভৃত্যসমেত, তাঁহাকে হস্তীতে আরোহণ করাইয়া, জলার প্রান্তভাগে উপস্থিত করিলেন। তথায় উপস্থিত হইবামাত্র, শত্রুপক্ষ হইতে এক গোলা আসিয়া তাঁহার কপালে লাগিল। তিনি তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। সৈন্যেরা, তাঁহাকে প্রাণত্যাগ করিতে দেখিয়া, শ্রেণিভঙ্গপূর্বক পলায়ন করিল। দুই দিবস পরে, নবাবের সেনাপতি মোহনলাল পূর্ণিয়া অধিকার করিলেন, এবং তথাকার ধনাগারে প্রাপ্ত ন্যূনাধিক নবতি লক্ষ টাকা ও সকতজঙ্গের যাবতীয় অন্তঃপুরিকাগণ মুরশিদাবাদে পাঠাইয়া দিলেন।

(সংক্ষেপিত ও সম্পাদিত)

গগন-পটো

অক্ষয়চন্দ্র সরকার

গগন-পটোকে তোমরা সকলেই দেখিয়াছ; পথে-ঘাটে দাঁড়াইয়া কতবারই দেখিয়া থাকিবে। কিন্তু তোমরা সকলে তাহার গুণাগুণ জান না, তাই আমাদিগকে আজ তোমাদের কাছে সেই পরিচিতের পরিচয় দিতে হইতেছে।

কারিগর লোক প্রায়ই একটু খাম্‌খেয়ালি হয়; কেহ বদমেজাজের উপর খামখেয়ালি, আর কেহ-বা রসখ্যাপার উপর খামখেয়ালি। কিন্তু গগন-পটোর মতো খামখেয়ালি রসখ্যাপা লোক আর দুনিয়ায় নাই। সে যদি কখনও কাহারও ফরমাশ মতো চিত্র করিল! আপনার মনে আপনার ঝোঁকে নিয়তই আঁকিতেছে, আর পুঁছিতেছে, কিন্তু যখন যেটা দাঁড় করাইবে, সেটা একেবারে চূড়ান্ত। যেমন রং আর তেমনি 'শেড'; যেমন ভাবভঙ্গি, তেমনি অঙ্গসৌষ্ঠব! তাহাতেই বলিতেছিলাম, গগন-পটো খামখেয়ালি বটে, কিন্তু মস্ত কারিগর।

তবে গগনের অনেক সময় সময়-অসময় বোধ নাই। প্রথম আলাপে সেইজন্য গগনের উপর বড়ই বিরক্ত হইতে হয়; কিন্তু তাহার পর ঘনিষ্ঠতা হইলে বুঝা যায়, লোকটা অসাময়িক হইলেও বদরসিক নহে; রসখ্যাপা বটে, কিন্তু তাহার অন্তরের অন্তরে লুকানো ছাপানো সহৃদয়তা বিলক্ষণ আছে। তবে সহিষ্ণুতা না থাকিলে, ঘনিষ্ঠতা না হইলে তাহার সেই ভাবটুকু কিন্তু বুঝিয়া উঠা ভার।

তুমি স্বজনের সদ্যোনাশে শোকে জরজর, সংসার আঁধার দেখিতেছ, থাকিয়া থাকিয়া তলদেশে মেদিনী ঘুরিতেছে, বাতাসে হুহু করিয়া সেই স্বজনের নাম ধ্বনিত হইতেছে, বুকের ভিতর বামদিকে কে যেন কীলক পুঁতিয়া দিয়াছে,— ঘোরতর বিষাদে তুমি অবসন্ন হইয়াছ। আকুলস্বরা কুলকুলনাদিনী কল্লোলিনীর তীরে তুমি অবসাদে উপবিষ্ট হইয়া আছ। দূরে গগন-পটোর চিত্রপটে তোমার দৃষ্টি পড়িল। সে যেন তোমাকেই ভুলাইবে বলিয়া রং ফলাইয়া বসিয়া ছিল; তুমি চাহিবামাত্র অমনই তাড়াতাড়ি পরিষ্কার পটে আঁকিতে বসিয়া গেল। শোকগম্ভীর হৃদয় সহজেই এক-মনস্ক হয়,— তুমি একমনে সেই অপূর্ব চিত্রণ দেখিতে লাগিলে। তোমার সেই স্বজনের সৌম্যমূর্তিই-বা আঁকিবে। তা-তো নয়!—ভীষণদংষ্ট্র একটা বিষম ব্যাঘ্র কাহাকে যেন কামড়াইয়া রহিয়াছে। তোমার বোধ হইল, সেই ব্যাঘ্রদষ্ট ব্যক্তিই যেন তোমার স্বজন। তোমার বুকের শেল কে যেন নাড়িয়া দিল, তোমার মর্ম-জ্বালা হইল,—গগন-চিত্রকরকে মহা নিষ্ঠুর স্থির করিয়া মহা বিরক্ত হইলে।

তুমি মুখ ফিরাইবে, এমন সময় চকিতের মধ্যে দেখিলে যে, চিত্রপটে আর সে ভয়ানক ব্যাঘ্র নাই, তোমার সেই ভূপাতিত বন্ধু সৌম্যমূর্তিতে গগনের পট শোভা করিতেছেন, আর, একখানি সুন্দর হস্ত যেন তাঁহাকে আস্তে আস্তে কোথায় মন্দ মন্দ লইয়া যাইতেছে। তোমার প্রাণ যেন একটু শীতল হইল, তুমি একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলে; ভাবিলে, গগন-পটো খ্যাপা হউক, আর যাহাই হউক— মনের কথা বুঝিতে পারে,— পোড়া মন একটু শীতল করিতে পারে। মনে যদি একবার ধারণা হয় যে, লোকটা সহৃদয় এবং তোমার ব্যথার ব্যথী, তাহা হইলেই তাহাকে ভালোবাসিতে হয়। আর হৃদয় যখন শোকে-তাপে গম্ভীর, তখন ভালোবাসাও এক দিনে— এক মুহূর্তে প্রগাঢ় হইয়া পড়ে। তুমি অন্তরের অন্তরে বুঝিলে যে, গগন তোমার ব্যথার ব্যথী, অমনই যেন তাহার উপর তোমার একটু ভালোবাসা জন্মিল। তুমি নদীতীরস্থ শষ্পশয্যায় শায়িত হইয়া একমনে, স্থিরনয়নে গগনের খামখেয়ালির কারিগরি পর্যালোচনা করিতে লাগিলে।

গগন আঁকিল—একটা বৃহৎ কুম্ভীর, সূচালো মুখ, কর্কশ গাত্র, কণ্টকিত লাঙ্গুল কপিল বর্ণ, ভয়ঙ্কর ভঙ্গি— সব ঠিকঠাক হুবহু,— যেন অগাধ নীল জলে সাঁতার দিতেছে। হঠাৎ কুম্ভীর দ্বিখণ্ডীকৃত হইল, গায়ের কাঁটাগুলি তূলার মতো ফুলো ফুলো হইল, মুখকোণ সংযত হইল, রংটা কেমন একটু ঘোলা ঘোলা হইল। পরক্ষণেই দেখো, দুইটি নিরীহ মেষ পাশাপাশি ঘেঁষাঘেঁষি সেই নীল প্রান্তরে শনৈঃশনৈঃ বিচরণ করিতেছে। তুমি ভাবিতেছ, ভয়ঙ্কর কুম্ভীর যমজ মেষশিশু হইল; ভাবিতে না ভাবিতেই সে চিত্র নাই। সেই মেষদ্বয়ের স্থলে বিচিত্র বর্ণের বৃহৎ এক সদণ্ড পতাকা, খর খর বাতাসে যেন ফরফর করিয়া উড়িতেছে। স্বজনবিয়োগ-চিন্তা তোমার মন হইতে ক্ষণেকের তরে অন্তর্হিত হইল। বিষম রসখ্যাপা গগন তোমাকে আপনার পাগলামির কীর্তি দেখাইয়া তোমাকে হাসাইল। তোমার সেই মলিন ম্লান মুখের অধরপ্রান্তে সেই অন্তরের হাসি ঈষৎ দেখা দিল। তুমি অন্তরে বলিলে, পাগলা পটোর ভিতরের কথাটা ঠিক— সংসারের সকলই তো এইরূপ পরিবর্তনশীল, তা ওই কেবল স্থাবর চিত্র আঁকিবে কেন?

এই চিন্তায় তুমি অন্যমনস্ক হইয়াছিলে,— দেখিলে সে বিচিত্র নিশান আর নাই, — মৃদু আভায় একটি স্থির চিতা যেন ধীরিধীরি জ্বলিতেছে। সেই চিতার মধ্যে অস্পষ্ট অবয়বে তোমার সেই স্বজনের শবমূর্তি। শবদেহ কিন্তু নিষ্প্রভ নহে,— সূর্যাস্ত-কালের পূর্বদিকের পাতলা মেঘের উপর ক্ষীণ রামধনুর ন্যায় একটু হাসি যেন সেই মুখপ্রান্তে দেখা দিতেছে, চক্ষুর্দ্বয়ের প্রশান্ত শীতল জ্যোতি গগনের চিত্রান্তরে যেন স্থাপিত রহিয়াছে।

দিব্যাঙ্গনা ভাসিয়া ভাসিয়া নিম্নস্তরের চিতার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, নিম্নস্তরের চিতাও শবদেহ লইয়া দিব্যাঙ্গনার দিকে প্রবাহিত হইতে লাগিল,— কাছাকাছি হইল, তোমার চক্ষুতে জল আসিল; চক্ষু মুছিয়া চাহিয়া দেখিলে সে সব আর কিছু নাই,— গগন-পটো নীল পটের এখানে-সেখানে কেবল কাঁচা সোনার স্তবক আঁটিতেছে, আর তাহাতে জরদ, ধূমল, পাংশু কত বিচিত্র রঙের শেড দিতেছে। তুমি উঠিয়া বসিলে, দির্ঘনিশ্বাস ফেলিলে, এবার মুখ ফুটিয়া বলিয়া উঠিলে,— ‘গগন সকলকেই জানে,— সকলকেই চেনে; আমরা কিন্তু উহাকে কেহই চিনিতে পারিলাম না। দেখো, আমাদের সকল সংবাদই রাখে, আমরা কিন্তু উহার কিছুই জানি না।’

গগনের কার্যসাধন হইয়াছে। তাহার সহিত একবার ঘনিষ্ঠতা করিলেই সে তাহার অস্থাবর পট দেখাইয়া তোমার কিছু-না-কিছু ভালো করিবেই। হয় তোমার মনের কবাট খুলিয়া দিবে, নয় তোমার শোকের সান্ত্বনা করিবে। কখনও হয়তো তোমার আনন্দের সংবর্ধনা করিবে, আবার কখনও হয়তো তোমাকে ধর্মের দিকে আকর্ষণ করিবে। আজ সে তোমার শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে সান্ত্বনা দান করিয়াছে, তোমার মাথা হাল্‌কা হইয়াছে বটে,— এখন আর ঘুরিতেছে না; বাতাস এখনও হু হু করিতেছে— এখনও পিলুরাগিণীতে ভরিয়া আছে, কিন্তু এখন তো আর তোমার বন্ধুর নাম করিয়া কাঁদিতেছে না; বুকে এখনও শেল বাঁধিয়া আছে বটে, কিন্তু তেমন করিয়া আর তো কেহ তাহাকে মোচড় দিতেছে না। গগনের কার্য সমাধা হইয়াছে। গগন তোমার শোকবহ্নির প্রখরতা নষ্ট করিয়াছে। তুমি এবার ধীরে ধীরে ফিরিয়া দেখিলে পশ্চিমের দিক্‌-চক্রবাল ব্যাপিয়া ঘন সন্নিবেশিত শাল-বিটপি-আচ্ছাদিত পর্বত-বেদীর উপরি জ্বলন্ত কাঞ্চনরাগে এক অপূর্ব প্রতিমা দীপ্তি পাইতেছে। গগন-পটোর সেই এক প্রিয় প্রতিমা। মাস মাস ধরিয়া প্রত্যহই আঁকে, আর প্রত্যহই পুঁছিয়া ফেলে,— তাহার বিরক্তিও নাই, তৃপ্তিও নাই।

ওই প্রতিমা একখানি আশ্চর্য ছবি। গগন-পটো প্রায়ই প্রত্যহ আঁকে, আর আমরাও তো প্রায়ই প্রত্যহ দেখি, তবু নিত্যই নূতন। পুরাণের পুরাণ মহাপুরাণকে নূতন করিয়া দেখাইতে গগন-পটো যেমন পটু, এমন আর দ্বিতীয় নাই। কিন্তু কেবল তাই বলিয়া যে পশ্চিমের প্রতিমা আশ্চর্য ছবি, তাহা নহে। ও-এক আজগুবি কাণ্ড।— মুখ নাই অথচ দেখ কেমন হাসিতেছে; চোখ নাই, ভ্রূ নাই— তবু দেখ কেমন চোখ রাঙাইয়া ভ্রূকুটি করিয়া রহিয়াছে। আর আশ্চর্যের আশ্চর্য— ওই মধুর হাসিতে আর ওই ভীষণ ভ্রূকুটিতে দেখো দেখি কেমন মাখামাখি, কেমন মেশামেশি। ওই দেখো কেমন অপূর্ব হাসি! ঢলঢল তপ্ত কাঞ্চনসাগরে যেন অমৃতের লহরী উঠিল। ওই দেখো কেমন রাগ! ব্রহ্ম-কোপানলে যেন খাণ্ডব দাহ হইবে। ওই দেখো নিঃশব্দ, তবু যেন তোমাকে স্বর্গের বার্তা ধীরে ধীরে বুঝাইয়া দিতেছে; চক্ষু নাই, তবু যেন তোমার মনের অন্তস্তল পর্যন্ত দেখিতে পাইতেছে। আর দেখো, নিশ্চল, সুস্থির— তথাপি যেন হাত তুলিয়া তোমাকে অভয়দান করিতেছে, আশীর্বাদ করিতেছে। এসো, আমরা প্রণত হই। সঙ্গে সঙ্গে মহাশিল্পী গগন-চিত্রকরকে নমস্কার করি এবং তাহার ওস্তাদকে একবার দেখাইবার জন্য তাহার কাছে প্রার্থনা করি।

গগন-দাদা! তোমার খ্যাপামিতে ক্ষান্ত দিয়া একবার আমাদের গুটিকত কথা শুন। গঙ্গার উপর তোমার প্রভাতচ্ছবি, পর্বতপৃষ্ঠে তোমার এই সন্ধ্যার প্রতিমা, প্রাবৃটের সেই ঘনকৃষ্ণ সিংহাসন, নিদাঘের সেই রৌদ্রমূর্তি—ও-সকল কারিগরি তোমার অনেকবার দেখিয়াছি। তোমার বিচিত্র পট দেখিয়া অনেকবার জ্বলিয়াছি, পুড়িয়াছি, হাসিয়াছি, কাঁদিয়াছি; কিন্তু ওই সকল বিচিত্র চিত্রে আত্মহারা হই বটে, অথচ পরমার্থ পাই না, তুষ্টি হইলেও তৃপ্তি হয় না। না দাদা আর খ্যাপামি করিয়া আমাকে ভুলাইবার চেষ্টা করিয়ো না। তোমার এই সকল ছায়াময়ী প্রতিমার অন্তরস্থ প্রতিমা আমাকে সেই সেদিনের মতো আর একবার দেখাও। তোমার সেই বিষম ভেলকি আর একবার ভাঙিয়া দাও। এই ছায়াবাজির ছায়াপট একবার ক্ষণমুহূর্ত-জন্য সরাইয়া দাও— আমি আর একবার তোমার সেই নীল, নীল, অতি নীল বাজিঘরের অভ্যন্তরস্থ তোমার ওস্তাদকে প্রাণ ভরিয়া দেখিব। সেদিন তুমি দেখাইলে বটে, কিন্তু আমি যে কী দেখিলাম, তাহার কিছুই বুঝিলাম না। কোমলের কোমল অতি কোমল বংশীরবে আমার মোহ হইল; নীল-মধ্যে অতি নীল দেখিতেছিলাম, সমস্ত জগৎ নীল আভায় প্রতিভাত হইল— আমি আর কিছুই দেখিতে পাইলাম না। তাহার পর তুমি তোমার ছায়াপটে তুলারাশি ছড়াইয়া হাসিতে লাগিলে। না দাদা! তোমার পায়ে পড়ি, এবার আর ও-সময়ে খ্যাপামি করিও না; ভালো করিয়া তোমার ওস্তাদকে একবার দেখাও।

(সম্পাদিত)

কঙ্কাবতী

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়

বন-জঙ্গল, গিরি-গুহা অতিক্রম করিয়া উন্মাদিনীর ন্যায় কঙ্কাবতী চলিলেন। কত পথ যাইলেন, কতদূর চলিয়া গেলেন, কিন্তু গ্রাম দেখিতে পাইলেন না। রাত্রি প্রভাত হইল, সূর্য উদয় হইলেন, দিন বাড়িতে লাগিল, তবুও জনমানবের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল না।

'কী করি, কোন দিকে যাই, কাহাকে জিজ্ঞাসা করি' কঙ্কাবতী এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় সম্মুখে একটি ব্যাং দেখিতে পাইলেন। ব্যাঙের অপূর্ব মূর্তি। সেই অপূর্ব মূর্তি দেখিয়া কঙ্কাবতী বিস্মিত হইলেন। ব্যাঙের মাথায় হ্যাট, গায়ে কোট, কোমরে পেন্টুলেন, ব্যাং সাহেবের পোশাক পরিয়াছেন। ব্যাং-কে আর চেনা যায় না। রংটি কেবল ব্যাঙের মতো আছে, সাবান মাখিয়াও রংটি সাহেবের মতো হয় নাই। আর, পায়ে জুতা এখনও কেনা হয় নাই। ইহার পর তখন কিনিয়া পরিবেন। আপাতত সাহেবের সাজ সাজিয়া দুই পকেটে হাত রাখিয়া, সদর্পে ব্যাং চলিয়া যাইতেছেন।

এই অপূর্ব মূর্তি দেখিয়া, এই ঘোর দুঃখের সময়ও কঙ্কাবতীর মুখে ঈষৎ একটু হাসি দেখা দিল। কঙ্কাবতী মনে করিলেন,—'ইহাকে আমি পথ জিজ্ঞাসা করি।'

কঙ্কাবতী জিজ্ঞাসা করিলেন,—'ব্যাং মহাশয়! গ্রাম কোন্ দিকে? কোন্ দিক দিয়া যাইলে লোকালয়ে পৌঁছিব?'

ব্যাং উত্তর করিলেন,—'হিট মিট ফ্যাট।"

কঙ্কাবতী বলিলেন,—'ব্যাং মহাশয়! আপনি কী বলিলেন, তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না। ভালো করিয়া বলুন। আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি—কোন দিক দিয়া যাইলে গ্রামে গিয়া উপস্থিত হইতে পারা যায়?'

ব্যাং বলিলেন,—'হিশ ফিশ ড্যাম।"

কঙ্কাবতী বলিলেন,—'ব্যাং মহাশয়! আমি দেখিতেছি,—আপনি ইংরেজি কথা কহিতেছেন। আমি ইংরেজি পড়ি নাই, আপনি কী বলিতেছেন, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না, অনুগ্রহ করিয়া যদি বাংলা করিয়া বলেন, তাহা হইলে আমি বুঝিতে পারি।'

ব্যাং এদিক-ওদিক চাহিয়া দেখিলেন। দেখিলেন যে, কেহ কোথাও নাই। কারণ, লোকে যদি শুনে যে, তিনি বাংলা কথা কহিয়াছেন, তাহা হইলে তাঁহার জাতি যাইবে, সকলে তাঁহাকে 'নেটিভ' মনে করিবে। যখন দেখিলেন, —কেহ কোথাও নাই, তখন বাংলা কথা বলিতে তাঁহার সাহস হইল।

কঙ্কাবতীর দিকে কোপদৃষ্টিতে চাহিয়া, অতিশয় ক্রুদ্ধভাবে ব্যাং বলিলেন,—'কোথাকার ছুঁড়ি রে তুই! আ গেল যা! দেখিতেছিস, আমি সাহেব! তবু বলে, ব্যাং মশাই, ব্যাং মশাই! কেন? সাহেব বলিতে তোর কী হয়?'

কঙ্কাবতী বলিলেন,—'ব্যাং সাহেব! আমার অপরাধ হইয়াছে, আমাকে ক্ষমা করুন। এক্ষণে গ্রামে যাইব কোন দিক দিয়া, অনুগ্রহ করিয়া আমাকে বলিয়া দিন।'

এই কথা শুনিয়া ব্যাং আরও জ্বলিয়া উঠিলেন, আরও ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বলিলেন,—'মোলো যা! এ হতভাগা ছুঁড়ির রকম দেখ! মানা করিলেও শুনে না। কথা গ্রাহ্য হয় না। কেবল বলিবে, ব্যাং, ব্যাং, ব্যাং! কেন? আমার নাম ধরিয়া ডাকিতে কি মুখে ব্যথা হয় নাকি? আমার নাম, মিস্টার গামিশ।'

কঙ্কাবতী বলিলেন,—'মহাশয়! আমার অপরাধ হইয়াছে। না জানিয়া অপরাধ করিয়াছি, আমাকে ক্ষমা করুন। এক্ষণে, মিস্টার গামিশ! আমি লোকালয়ে যাইব কোন দিক দিয়া, তাহা আমাকে বলিয়া দিন। আমার নাম কঙ্কাবতী। বড়ো বিপদে আমি পড়িয়াছি। প্রাণের পতিকে আমি হারাইয়াছি। পতির চিকিৎসার নিমিত্ত আমি গ্রাম অনুসন্ধান করিতেছি। রতিমাত্র বিলম্ব আর করিতে পারি না। এই হতভাগিনীর প্রতি দয়া করিয়া বলিয়া দিন—কোন দিক দিয়া আমি গ্রামে যাই!'

কঙ্কাবতী তাঁহাকে 'সাহেব' বলিলেন, কঙ্কাবতী তাঁহাকে 'মিস্টার গামিশ' বলিয়া ডাকিলেন, সে-জন্য ব্যাঙের শরীর শীতল হইল, রাগ একেবারে পড়িয়া গেল।

কঙ্কাবতীর প্রতি হৃষ্ট হইয়া ব্যাং জিজ্ঞাসা করিলেন,—'আমি সাহেব হইয়াছি কেন তা জান?'

কঙ্কাবতী উত্তর করিলেন,—'আজ্ঞে না! তা আমি জানি না। মহাশয়! গ্রামে কোন দিক দিয়া যাইতে হয়? গ্রাম এখান হইতে কতদূর?'

ব্যাং বলিলেন,—'দেখো লঙ্কাবতি! তোমার নাম লঙ্কাবতী বলিলে বুঝি? দেখো লঙ্কাবতি! একদিন আমি এই বনের ভিতর বসিয়া ছিলাম। হাতি সেই পথ দিয়া আসিতেছিল। আমি মনে করিলাম আমার মানমর্যাদা

রাখিয়া, অনেক ভয় করিয়া, হাতি অবশ্যই পাশ দিয়া যাইবে। একবার আস্পর্ধার কথা শুনো! দুটো হাতি পাশ দিয়া না গিয়া আমাকে ডিঙাইয়া গেল। রাগে আমার সর্বশরীর কাঁপিতে লাগিল। রাগ হইলে আমার আর জ্ঞান থাকে না। আমার ভয়ে তাই সবাই সদাই সশঙ্কিত। আমি ভাবিলাম, হাতিকে একবার উত্তমরূপে শিক্ষা দিতে হইবে। তাই আমি হাতিকে বলিলাম,—'উটকপালি চিরুন-দাঁতি বড়ো যে ডিঙুলি মোরে?' কেমন, বেশ ভালো বলি নাই, লঙ্কাবতি?'

কঙ্কাবতী বলিলেন,—আমার নাম কঙ্কাবতী; 'লঙ্কাবতী' নয়। আপনি উত্তম বলিয়াছেন। গ্রামে যাইবার পথ আপনি বলিয়া দিলেন না? তবে আমি যাই, আর আমি এখানে অপেক্ষা করিতে পারি না।

ব্যাং বলিলেন,—'শুনো না। অত তাড়াতাড়ি করো কেন? দুষ্ট হাতির একবার কথা শুনো। আমি রাগিয়াছি দেখিয়া তাহার প্রাণে ভয় হইল না। হাতিটি উত্তর করিল, —'থাক থাক থাক থ্যাবড়ানাকি ধর্মে রেখেছে তোরে!' হাঁ কঙ্কাবতি! আমার কি থ্যাবড়া নাক?'

কঙ্কাবতী ভাবিলেন যে, এই নাক লইয়া কাঁকড়ার অভিমান হইয়াছিল, আবার দেখিতেছি, এই ভেকটিরও সেই অভিমান।

কঙ্কাবতী বলিলেন,—'না, না। কে বলে আপনার থ্যাবড়া নাক? আপনার চমৎকার নাক! মহাশয়! এই দিক দিয়া কি গ্রামে যাইতে হয়?'

কিছুক্ষণের নিমিত্ত ব্যাং চিন্তায় মগ্ন হইলেন। কঙ্কাবতী মনে করিলেন, ভাবিয়া-চিন্তিয়া ইনি আমাকে পথ বলিয়া দিবেন। কখন পথ বলিয়া দেন, সেই প্রতীক্ষায় একাগ্রচিত্তে কঙ্কাবতী ব্যাঙের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন।

স্থির-গম্ভীরভাবে অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া অবশেষে ব্যাং বলিলেন,—'তবে বোধ হয় কথার মিল করিবার নিমিত্ত হাতি আমাকে থ্যাবড়া-নাকি' বলিয়াছে। কারণ, এই দেখো না? আমার কথায় আর হাতির কথায় মিল হয়—

উটকপালি চিরুন-দাঁতি বড়ো যে ডিঙুলি মোরে!

থাক্ থাক্ থাক্ থ্যাবড়া-নাকি ধর্মে রেখেছে তোরে?

কঙ্কাবতি! কবিতাটি খবরের কাগজে ছাপাইলে হয় না? কিন্তু ইহাতে আমার নিন্দা আছে, থ্যাবড়া নাকের কথা আছে। তাই খবরের কাগজে ছাপাইব না। শুনলে তো এখন? হাতির একবার আস্পর্ধার কথা। তাই আমি ভাবিলাম, সাহেব না হইলে লোকে মান্য করে না। সেইজন্য এই সাহেবের পোশাক পরিয়াছি। আমাকে ঠিক সাহেবের মতো দেখাইতেছে তো? এখন হইতে আমাকে সকলে সেলাম করিবে, সকলে ভয় করিবে। যখন রেলগাড়ির তৃতীয় শ্রেণিতে গিয়া চড়িব, তখন সে গাড়িতে অন্য লোক উঠিবে না। টুপি মাথায় দিয়া আমি দ্বারের নিকট গিয়া দাঁড়াইব। সকলে উঁকি মারিয়া দেখিবে, আর ফিরিয়া যাইবে,—আর বলিবে,—'ও গাড়িতে সাহেব রহিয়াছে। কেমন কঙ্কাবতি? এ পরামর্শ ভালো নয়?'

কঙ্কাবতী বলিলেন,—'উত্তম পরামর্শ! এক্ষণে অনুগ্রহ করিয়া পথ বলিয়া দিন! আর যদি না দেন, তো বলুন আমি চলিয়া যাই!'

কানে হাত দিয়া ব্যাং জিজ্ঞাসা করিলেন,—'কী বলিলে?'

কঙ্কাবতী বলিলেন, —'আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, কোন পথ দিয়া গ্রামে যাইব? গ্রাম এখান হইতে কতদূর! কতক্ষণে সেখানে গিয়া পৌঁছিব?'

ব্যাং বলিলেন,—'আমার একটা হিসাব করিয়া দাও। পথ দেখাইয়া দিব কী, আমি এখন ঘোর বিপদে পড়িয়াছি। আমার একটি আধুলি ছিল; একজনকে তাহা আমি ধার দিয়াছি। তাহার সহিত নিয়ম হইয়াছে যে, যাহা বাকি থাকিবে, প্রতিদিন তাহার অর্ধেক দিয়া সে ঋণ পরিশোধ করিবে। প্রথম দিন সে আমাকে চারি আনা দিবে, দ্বিতীয় দিন দুই আনা দিবে, তৃতীয় দিন এক আনা, চতুর্থ দিন দুই পয়সা, পঞ্চম দিন সে এক পয়সা দিবে। এক পয়সায় হয় পাঁচ গন্ডা, অর্থাৎ কুড়ি কড়া। ষষ্ঠ দিনে সে আমাকে দশ কড়া দিবে। তার পরদিন সে আমাকে পাঁচ কড়া দিবে। তার পরদিন আড়াই কড়া, তার পরদিন স-কড়া, তার পরদিন তার অর্ধেক, পরদিন তার অর্ধেক, পরদিন তার অর্ধেক—'

অতি চমৎকার সুমিষ্ট কান্না-সুরে ব্যাং এইবার গলা ছাড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন,—'ওগো! মা গো! এ যে আর কখনও শোধ হবে না গো! আমার আধুলিটি যে, আর কখনও পুরাপুরি হবে না গো! ওগো আমি কোথায় যাব গো! জুয়াচোরের হাতে পড়িয়া আমার যে সর্বস্ব গেল গো! ওগো আমার যে ওই আধুলিটি বই পৃথিবীতে আর কিছু নাই গো! ওগো তা লইয়া মানুষে যে ঠাট্টা করে গো! 'ব্যাঙের আধুলি', 'ব্যাঙের আধুলি' বলিয়া মানুষে যে হিংসায় ফাটিয়া মরে গো! ওগো মা গো! আমার কী হলো গো!'

ব্যাং পুনরায় আধ-কান্না সুরে ফুঁপিয়া-ফুঁপিয়া বলিলেন,—'ওগো! আমি যে মনে করিয়াছিলাম,—দুই দণ্ড বসিয়া তোমার সঙ্গে গল্পগাছা করিব গো! ওগো তা যে আর হইল না গো! ওগো আমার যে শোকসিন্ধু উথলিয়া উঠিল গো! ওগো তুমি ওই দিক দিয়া যাও গো! তাহা হইলে লোকালয়ে পৌঁছুতে পারিবে গো! ওগো সে যে অনেক দূর গো! ওগো আজ সেখানে যাইতে পারিবে না গো! ওগো তোমরা যে আমাদের মতো লাফাইতে পার না গো! ওগো তোমরা যে গুটি-গুটি চলিয়া যাও গো! ওগো তোমাদের চলন দেখিয়া, আমার যে কান্না পায় না গো! ওগো তুমি যে লোক ভালো গো।... আমার যে আধুলিটি এইবার জন্মের মতো গেল গো! ওগো! আমার কী হইল গো! ওগো মা গো!'

(সংক্ষেপিত ও সম্পাদিত)

পোস্টমাস্টার

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রথম কাজ আরম্ভ করিয়াই উলাপুর গ্রামে পোস্টমাস্টারকে আসিতে হয়। গ্রামটি অতি সামান্য। নিকটে একটি নীলকুঠি আছে, তাই কুঠির সাহেব অনেক জোগাড় করিয়া এই নূতন পোস্টআপিস স্থাপন করাইয়াছে।

আমাদের পোস্টমাস্টার কলিকাতার ছেলে। জলের মাছকে ডাঙায় তুলিলে যেরকম হয়, এই গণ্ডগ্রামের মধ্যে আসিয়া পোস্টমাস্টারেরও সেই দশা উপস্থিত হইয়াছে। একখানি অন্ধকার আটচালার মধ্যে তাঁহার আপিস; অদূরে একটা পানাপুকুর এবং তাহার চারি পাড়ে জঙ্গল। কুঠির গোমস্তা প্রভৃতি যে-সকল কর্মচারী আছে তাহাদের ফুরসত প্রায় নাই এবং তাহারা ভদ্রলোকের সহিত মিশিবার উপযুক্ত নহে।

বিশেষত কলিকাতার ছেলে ভালো করিয়া মিশিতে জানে না। অপরিচিত স্থানে গেলে, হয় উদ্ধত নয় অপ্রতিভ হইয়া থাকে। এই কারণে স্থানীয় লোকের সহিত তাঁহার মেলামেশা হইয়া উঠে না। অথচ হাতে কাজ অধিক নাই। কখনো-কখনো দুটো-একটা কবিতা লিখিতে চেষ্টা করেন। তাহাতে এমন ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন যে, সমস্ত দিন তরুপল্লবের কম্পন এবং আকাশের মেঘ দেখিয়া জীবন বড়ো সুখে কাটিয়া যায়—কিন্তু অন্তর্যামী জানেন, যদি আরব্য উপন্যাসের কোনো দৈত্য আসিয়া এক রাত্রের মধ্যে এই শাখাপল্লব-সমেত সমস্ত গাছগুলা কাটিয়া পাকা রাস্তা বানাইয়া দেয় এবং সারি সারি অট্টালিকা আকাশের মেঘকে দৃষ্টিপথ হইতে রুদ্ধ করিয়া রাখে, তাহা হইলে এই আধমরা ভদ্রসন্তানটি পুনশ্চ নবজীবন লাভ করিতে পারে।

পোস্টমাস্টারের বেতন অতি সামান্য। নিজে রাঁধিয়া খাইতে হয় এবং গ্রামের একটি পিতৃমাতৃহীন অনাথা বালিকা তাঁহার কাজকর্ম করিয়া দেয়, চারিটি-চারিটি খাইতে পায়। মেয়েটির নাম রতন। বয়স বারো-তেরো। বিবাহের বিশেষ সম্ভাবনা দেখা যায় না।

সন্ধ্যার সময় যখন গ্রামের গোয়ালঘর হইতে ধূম কুণ্ডলায়িত হইয়া উঠিত, ঝোপে ঝোপে ঝিল্লি ডাকিত, দূরে গ্রামের নেশাখোর বাউলের দল খোল-করতাল বাজাইয়া উচ্চৈঃস্বরে গান জুড়িয়া দিত—যখন অন্ধকার দাওয়ায় একলা বসিয়া গাছের কম্পন দেখিলে কবিহৃদয়েও ঈষৎ হৃৎকম্প উপস্থিত হইত, তখন ঘরের কোণে একটি ক্ষীণশিখা প্রদীপ জ্বালিয়া পোস্টমাস্টার ডাকিতেন—'রতন।' রতন দ্বারে বসিয়া এই ডাকের জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিত কিন্তু এক ডাকেই ঘরে আসিত না; বলিত, 'কী গা বাবু, কেন ডাকছ।'

পোস্টমাস্টার। তুই কী করছিস!

রতন। এখনই চুলো ধরাতে যেতে হবে—হেঁশেলের—

পোস্টমাস্টার। তোর হেঁশেলের কাজ পরে হবে এখন—একবার তামাকটা সেজে দে তো।

অনতিবিলম্বে দুটি গাল ফুলাইয়া কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে রতনের প্রবেশ। হাত হইতে কলিকাটা লইয়া পোস্টমাস্টার ফস করিয়া জিজ্ঞাসা করেন, 'আচ্ছা রতন, তোর মাকে মনে পড়ে?' সে অনেক কথা; কতক মনে পড়ে, কতক মনে পড়ে না। মায়ের চেয়ে বাপ তাহাকে বেশি ভালোবাসিত, বাপকে অল্প অল্প মনে আছে। পরিশ্রম করিয়া বাপ সন্ধ্যাবেলায় ঘরে ফিরিয়া আসিত, তাহারই মধ্যে দৈবাৎ দুটি-একটি সন্ধ্যা তাহার মনে পরিষ্কার ছবির মতো অঙ্কিত আছে। এই কথা হইতে হইতে ক্রমে রতন পোস্টমাস্টারের পায়ের কাছে মাটির উপর বসিয়া পড়িত। মনে পড়িত, তাহার একটি ছোটো ভাই ছিল—বহু পূর্বেকার বর্ষার দিনে একদিন একটা ডোবার ধারে দুইজনে মিলিয়া গাছের ভাঙা ডালকে ছিপ করিয়া মিছামিছি মাছধরা খেলা করিয়াছিল—অনেক গুরুতর ঘটনার চেয়ে সেই কথাটাই তাহার মনে বেশি উদয় হইত। এইরূপ কথা প্রসঙ্গে মাঝে মাঝে বেশি রাত হইয়া যাইত, তখন আলস্যক্রমে পোস্টমাস্টারের আর রাঁধিতে ইচ্ছা করিত না। সকালের বাসি ব্যঞ্জন থাকিত এবং রতন তাড়াতাড়ি উনুন ধরাইয়া খানকয়েক রুটি সেঁকিয়া আনিত—তাহাতেই উভয়ের রাত্রের আহার চলিয়া যাইত।

এক-একদিন সন্ধ্যাবেলায় সেই বৃহৎ আটচালার কোণে আপিসের কাঠের চৌকির উপর বসিয়া পোস্টমাস্টারও নিজের ঘরের কথা পাড়িতেন—ছোটো ভাই, মা এবং দিদির কথা, প্রবাসে একলা ঘরে বসিয়া যাহাদের জন্য

হৃদয় ব্যথিত হইয়া উঠিত তাহাদের কথা। যে-সকল কথা সর্বদাই মনে উদয় হয় অথচ নীলকুঠির গোমস্তাদের কাছে যাহা কোনোমতেই উত্থাপন করা যায় না, সেই কথা একটি অশিক্ষিতা ক্ষুদ্র বালিকাকে বলিয়া যাইতেন, কিছুমাত্র অসংগত মনে হইত না। অবশেষে এমন হইল, বালিকা কথোপকথনকালে তাঁহার ঘরের লোকদিগকে মা দিদি দাদা বলিয়া চিরপরিচিতের ন্যায় উল্লেখ করিত। এমনকি, তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়পটে বালিকা তাঁহাদের কাল্পনিক মূর্তিও চিত্রিত করিয়া লইয়াছিল।

একদিন বর্ষাকালে মেঘমুক্ত দ্বিপ্রহরে ঈষৎ-তপ্ত সুকোমল বাতাস দিতেছিল; রৌদ্রে ভিজা ঘাস এবং গাছপালা হইতে একপ্রকার গন্ধ উত্থিত হইতেছিল; মনে হইতেছিল, যেন ক্লান্ত ধরণীর উষ্ণ নিশ্বাস গায়ের উপরে আসিয়া লাগিতেছে; এবং কোথাকার এক নাছোড়বান্দা পাখি তাহার একটা একটানা সুরের নালিশ সমস্ত দুপুরবেলা প্রকৃতির দরবারে অত্যন্ত করুণস্বরে বারবার আবৃত্তি করিতেছিল। পোস্টমাস্টারের হাতে কাজ ছিল না—সেদিনকার বৃষ্টিধৌত মসৃণ চিক্কণ তরুপল্লবের হিল্লোল এবং পরাভূত বর্ষার ভগ্নাবশিষ্ট রৌদ্রশুভ্র স্তূপাকার মেঘস্তর বাস্তবিকই দেখিবার বিষয় ছিল; পোস্টমাস্টার তাহা দেখিতেছিলেন এবং ভাবিতেছিলেন, এই সময় কাছে একটি-কেহ নিতান্ত আপনার লোক থাকিত—হৃদয়ের সহিত একান্ত সংলগ্ন একটি স্নেহপুত্তলি মানবমূর্তি। ক্রমে মনে হইতে লাগিল, সেই পাখি ওই কথাই বার বার বলিতেছে এবং এই জনহীন তরুচ্ছায়ানিমগ্ন মধ্যাহ্নের পল্লবমর্মরের অর্থও কতকটা ওইরূপ। কেহ বিশ্বাস করে না, এবং জানিতেও পায় না, কিন্তু ছোটো পল্লির সামান্য বেতনের সাব-পোস্টমাস্টারের মনে গভীর নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে দীর্ঘ ছুটির দিনে এইরূপ একটা ভাবের উদয় হইয়া থাকে।

পোস্টমাস্টার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ডাকিলেন 'রতন।' রতন তখন পেয়ারাতলায় পা ছড়াইয়া দিয়া কাঁচা পেয়ারা খাইতেছিল; প্রভুর কণ্ঠস্বর শুনিয়া অবিলম্বে ছুটিয়া আসিল—হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, 'দাদাবাবু, ডাকছ?' পোস্টমাস্টার বলিলেন, 'তোকে আমি একটু একটু করে পড়তে শেখাব।' বলিয়া সমস্ত দুপুরবেলা তাহাকে লইয়া 'স্বরে অ' 'স্বরে আ' করিলেন। এবং এইরূপে অল্পদিনেই যুক্ত-অক্ষর উত্তীর্ণ হইলেন।

শ্রাবণ মাসে বর্ষণের আর অন্ত নাই। খাল বিল নালা জলে ভরিয়া উঠিল। অহর্নিশি ভেকের ডাক এবং বৃষ্টির শব্দ। গ্রামের রাস্তায় চলাচল প্রায় একপ্রকার বন্ধ—নৌকায় করিয়া হাটে যাইতে হয়।

একদিন প্রাতঃকাল হইতে খুব বাদলা করিয়াছে। পোস্ট্‌মাস্টারের ছাত্রীটি অনেকক্ষণ দ্বারের কাছে অপেক্ষা করিয়া বসিয়াছিল, কিন্তু অন্যদিনের মতো যথাসাধ্য নিয়মিত ডাক শুনিতে না পাইয়া আপনি খুঙ্গিপুথি লইয়া ধীরে ধীরে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। দেখিল, পোস্টমাস্টার তাঁহার খাটিয়ার উপর শুইয়া আছেন—বিশ্রাম করিতেছেন মনে করিয়া অতি নিঃশব্দে পুনশ্চ ঘর হইতে বাহিরে যাইবার উপক্রম করিল। সহসা শুনিল—'রতন'। তাড়াতাড়ি ফিরিয়া গিয়া বলিল, 'দাদাবাবু, ঘুমোচ্ছিলে?' পোস্টমাস্টার কাতরস্বরে বলিলেন, 'শরীরটা ভালো বোধ হচ্ছে না—দেখ তো আমার কপালে হাত দিয়ে।'

এই নিতান্ত নিঃসঙ্গ প্রবাসে ঘনবর্ষায় রোগকাতর শরীরে একটুখানি সেবা পাইতে ইচ্ছা করে। তপ্ত ললাটের উপর শাঁখাপরা কোমল হস্তের স্পর্শ মনে পড়ে। এই ঘোর প্রবাসে রোগযন্ত্রণায় স্নেহময়ী নারী-রূপে জননী ও

দিদি পাশে বসিয়া আছেন এই কথা মনে করিতে ইচ্ছা করে, এবং এ স্থলে প্রবাসীর মনের অভিলাষ ব্যর্থ হইল না। বালিকা রতন আর বালিকা রহিল না। সেই মুহূর্তেই সে জননীর পদ অধিকার করিয়া বসিল, বৈদ্য ডাকিয়া আনিল, যথাসময়ে বটিকা খাওয়াইল, সারারাত্রি শিয়রে জাগিয়া রহিল, আপনি পথ্য রাঁধিয়া দিল, এবং শতবার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'হাঁগো দাদাবাবু, একটুখানি ভালো বোধ হচ্ছে কি।'

বহুদিন পরে পোস্টমাস্টার ক্ষীণ শরীরে রোগশয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিলেন; মনে স্থির করিলেন, আর নয়, এখান হইতে কোনোমতে বদলি হইতে হইবে। স্থানীয় অস্বাস্থ্যের উল্লেখ করিয়া তৎক্ষণাৎ কলিকাতায় কর্তৃপক্ষদের নিকট বদলি হইবার জন্য দরখাস্ত করিলেন।

রোগসেবা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া রতন দ্বারের বাহিরে আবার তাহার স্বস্থান অধিকার করিল। কিন্তু পূর্ববৎ আর তাহাকে ডাক পড়ে না। মাঝে মাঝে উঁকি মারিয়া দেখে, পোস্টমাস্টার অত্যন্ত অন্যমনস্কভাবে চৌকিতে বসিয়া অথবা খাটিয়ায় শুইয়া আছেন। রতন যখন আহ্বান প্রত্যাশা করিয়া বসিয়া আছে, তিনি তখন অধীরচিত্তে তাঁহার দরখাস্তের উত্তর প্রতীক্ষা করিতেছেন। বালিকা দ্বারের বাহিরে বসিয়া সহস্রবার করিয়া তাহার পুরানো পড়া পড়িল। পাছে যেদিন সহসা ডাক পড়িবে সেদিন তাহার যুক্ত-অক্ষর সমস্ত গোলমাল হইয়া যায়, এই তাহার একটা আশঙ্কা ছিল। অবশেষে সপ্তাহখানেক পরে একদিন সন্ধ্যাবেলায় ডাক পড়িল। উদ্‌বেলিতহৃদয়ে রতন গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিল, 'দাদাবাবু, আমাকে ডাকছিলে?'

পোস্ট্‌মাস্টার বলিলেন, 'রতন, কালই আমি যাচ্ছি।'

রতন। কোথায় যাচ্ছ, দাদাবাবু!

পোস্টমাস্টার। বাড়ি যাচ্ছি।

রতন। আবার কবে আসবে।

পোস্টমাস্টার। আর আসব না।

রতন আর কোনো কথা জিজ্ঞাসা করিল না। পোস্টমাস্টার আপনিই তাহাকে বলিলেন, তিনি বদলির জন্য দরখাস্ত করিয়াছিলেন, দরখাস্ত নামঞ্জুর হইয়াছে; তাই তিনি কাজে জবাব দিয়া বাড়ি যাইতেছেন। অনেকক্ষণ আর কেহ কোনো কথা কহিল না। মিটমিট করিয়া প্রদীপ জ্বলিতে লাগিল এবং এক স্থানে ঘরের জীর্ণ চাল ভেদ করিয়া একটি মাটির সরার উপর টপটপ করিয়া বৃষ্টির জল পড়িতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে রতন আস্তে আস্তে উঠিয়া রান্নাঘরে রুটি গড়িতে গেল। অন্য দিনের মতো তেমন চটপট হইল না। বোধ করি মধ্যে মধ্যে মাথায় অনেক ভাবনা উদয় হইয়াছিল। পোস্টমাস্টারের আহার সমাপ্ত হইলে পর বালিকা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'দাদাবাবু, আমাকে তোমাদের বাড়ি নিয়ে যাবে?'

পোস্টমাস্টার হাসিয়া কহিলেন, 'সে কী করে হবে।' ব্যাপারটা যে কী কী কারণে অসম্ভব তাহা বালিকাকে বুঝানো আবশ্যক বোধ করিলেন না।

সমস্ত রাত্রি স্বপ্নে এবং জাগরণে বালিকার কানে পোস্টমাস্টারের হাস্যধ্বনির কণ্ঠস্বর বাজিতে লাগিল—'সে কী করে হবে'।

ভোরে উঠিয়া পোস্টমাস্টার দেখিলেন তাঁহার স্নানের জল ঠিক আছে, কলিকাতার অভ্যাস-অনুসারে তিনি তোলা জলে স্নান করিতেন। কখন তিনি যাত্রা করিবেন সে কথা বালিকা কী কারণে জিজ্ঞাসা করিতে পারে নাই; পাছে প্রাতঃকালে আবশ্যক হয় এইজন্য রতন তত রাত্রে নদী হইতে তাঁহার স্নানের জল তুলিয়া আনিয়াছিল। স্নান সমাপন হইলে রতনের ডাক পড়িল। রতন নিঃশব্দে গৃহে প্রবেশ করিল এবং আদেশ প্রতীক্ষায় একবার নীরবে প্রভুর মুখের দিকে চাহিল। প্রভু কহিলেন, 'রতন, আমার জায়গায় যে লোকটি আসবেন তাঁকে বলে দিয়ে যাব, তিনি তোকে আমারই মতন যত্ন করবেন; আমি যাচ্ছি বলে তোকে কিছু ভাবতে হবে না।' এই কথাগুলি যে অত্যন্ত স্নেহগর্ভ এবং দয়ার্দ্র হৃদয় হইতে উত্থিত সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই, কিন্তু নারীহৃদয় কে বুঝিবে। রতন অনেকদিন প্রভুর অনেক তিরস্কার নীরবে সহ্য করিয়াছে, কিন্তু এই নরম কথা সহিতে পারিল না। একেবারে উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে কাঁদিয়া উঠিয়া কহিল, 'না না, তোমার কাউকে কিছু বলতে হবে না, আমি থাকতে চাই নে।'

পোস্টমাস্টার রতনের এরূপ ব্যবহার কখনও দেখেন নাই, তাই অবাক হইয়া রহিলেন।

নূতন পোস্টমাস্টার আসিল। তাহাকে সমস্ত চার্জ বুঝাইয়া দিয়া পুরাতন পোস্টমাস্টার গমনোন্মুখ হইলেন। যাইবার সময় রতনকে ডাকিয়া বলিলেন, 'রতন, তোকে আমি কখনও কিছু দিতে পারিনি। আজ যাবার সময় তোকে কিছু দিয়ে গেলুম, এতে তোর দিন কয়েক চলবে।'

কিছু পথখরচা বাদে তাঁহার বেতনের যত টাকা পাইয়াছিলেন পকেট হইতে বাহির করিলেন। তখন রতন ধুলায় পড়িয়া তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, 'দাদাবাবু, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমাকে কিছু দিতে হবে না; তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমার জন্যে কাউকে কিছু ভাবতে হবে না'—বলিয়া এক দৌড়ে সেখান হইতে পলাইয়া গেল।

ভূতপূর্ব পোস্টমাস্টার নিশ্বাস ফেলিয়া, হাতে কার্পেটের ব্যাগ ঝুলাইয়া, কাঁধে ছাতা লইয়া মুটের মাথায় নীল ও শ্বেত রেখায় চিত্রিত টিনের পেঁটরা তুলিয়া ধীরে ধীরে নৌকাভিমুখে চলিলেন।

যখন নৌকায় উঠিলেন এবং নৌকা ছাড়িয়া দিল, বর্ষাবিস্ফারিত নদী ধরণীর উচ্ছলিত অশ্রুরাশির মতো চারিদিকে ছলছল করিতে লাগিল, তখন হৃদয়ের মধ্যে অত্যন্ত একটা বেদনা অনুভব করিতে লাগিলেন—একটি সামান্য গ্রাম্য বালিকার করুণ মুখচ্ছবি যেন এক বিশ্বব্যাপী বৃহৎ অব্যক্ত মর্মব্যথা প্রকাশ করিতে লাগিল। একবার নিতান্ত ইচ্ছা হইল, 'ফিরিয়া যাই, জগতের ক্রোড়বিচ্যুত সেই অনাথিনীকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসি'—কিন্তু তখন পালে বাতাস পাইয়াছে, বর্ষার স্রোত খরতর বেগে বহিতেছে, গ্রাম অতিক্রম করিয়া নদীকূলের শ্মশান দেখা দিয়াছে—এবং নদীপ্রবাহে ভাসমান পথিকের উদাস হৃদয়ে এই তত্ত্বের উদয় হইল, জীবনে এমন কত বিচ্ছেদ, কত মৃত্যু আছে, ফিরিয়া ফল কী। পৃথিবীতে কে কাহার।

কিন্তু রতনের মনে কোনো তত্ত্বের উদয় হইল না। সে সেই পোস্টআপিস গৃহের চারিদিকে কেবল অশ্রুজলে ভাসিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। বোধ করি তাহার মনে ক্ষীণ আশা জাগিতেছিল, দাদাবাবু যদি ফিরিয়া আসে—সেই বন্ধনে পড়িয়া কিছুতেই দূরে যাইতে পারিতেছিল না। হায় বুদ্ধিহীন মানবহৃদয়! ভ্রান্তি কিছুতেই ঘোচে না, যুক্তিশাস্ত্রের বিধান বহু বিলম্বে মাথায় প্রবেশ করে, প্রবল প্রমাণকেও অবিশ্বাস করিয়া মিথ্যা আশাকে দুই বাহুপাশে বাঁধিয়া বুকের ভিতরে প্রাণপণে জড়াইয়া ধরা যায়, অবশেষে একদিন সমস্ত নাড়ি কাটিয়া হৃদয়ের রক্ত শুষিয়া সে পলায়ন করে, তখন চেতনা হয় এবং দ্বিতীয় ভ্রান্তিপাশে পড়িবার জন্য চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠে।

যাত্রা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

একদিন মানুষ ছিল বুনো, ঘোড়াও ছিল বনের জন্তু। মানুষ ছুটিতে পারিত না, ঘোড়া বাতাসের মতো ছুটিত। কী সুন্দর তাহার ভঙ্গি, কী অবাধ তাহার স্বাধীনতা! মানুষ চাহিয়া দেখিত, আর তাহার ঈর্ষা হইত। সে ভাবিত, 'ওইরকম বিদ্যুৎগামী চারটে পা যদি আমার থাকিত তাহা হইলে দূরকে দূর মানিতাম না, দেখিতে দেখিতে দিগদিগন্তর জয় করিয়া আসিতাম।' ঘোড়ার সর্বাঙ্গে যে-একটি ছুটিবার আনন্দ দ্রুত তালে নৃত্য করিত সেইটের প্রতি মানুষের মনে মনে ভারী একটা লোভ হইল।

কিন্তু মানুষ শুধু-শুধু লোভ করিয়া বসিয়া থাকিবার পাত্র নহে। 'কী করিলে ঘোড়ার চারটে পা আমি পাইতে পারি' গাছের তলায় বসিয়া এই কথাই সে ভাবিতে লাগিল। এমন অদ্ভুত ভাবনাও মানুষ ছাড়া আর-কেহ ভাবে না। 'আমি দুই-পা-ওয়ালা খাড়া জীব, আমার চার পায়ের সংস্থান কি কোনোমতেই হইতে পারে? অতএব, চিরদিন আমি এক-এক পা ফেলিয়া ধীরে ধীরে চলিব আর ঘোড়া তড়বড় করিয়া ছুটিয়া চলিবে, এ বিধানের অন্যথা হইতেই পারে না!' কিন্তু, মানুষের অশান্ত মন এ কথা কোনোমতেই মানিল না।

একদিন সে ফাঁস লাগাইয়া বনের ঘোড়াকে ধরিল। কেশর ধরিয়া তাহার পিঠের উপর চড়িয়া বসিয়া নিজের দেহের সঙ্গে ঘোড়ার চার পা জুড়িয়া লইল। এই চারটে পা-কে সম্পূর্ণ নিজের বশ করিতে তাহার বহুদিন লাগিয়াছে, সে অনেক পড়িয়াছে, অনেক মরিয়াছে, কিন্তু কিছুতেই দমে নাই। ঘোড়ার গতিবেগকে সে ডাকাতি করিয়া লইবেই, এই তাহার পণ। তাহারই জিত হইল। মন্দগামী মানুষ দ্রুতগমনকে বাঁধিয়া ফেলিয়া আপনার কাজে খাটাইতে লাগিল।

ডাঙায় চলিতে চলিতে মানুষ এক জায়গায় আসিয়া দেখিল, সম্মুখে তাহার সমুদ্র, আর তো এগোইবার জো নাই। নীল জল, তাহার তল কোথায়, তাহার কূল দেখা যায় না। আর, লক্ষ লক্ষ ঢেউ তর্জনী তুলিয়া ডাঙার মানুষদের শাসাইতেছে; বলিতেছে, 'এক পা যদি এগোও তবে দেখাইয়া দিব, এখানে তোমার জারিজুরি খাটিবে না।' মানুষ তীরে বসিয়া এই অকূল নিষেধের দিকে চাহিয়া রহিল। কিন্তু, নিষেধের ভিতর দিয়া একটা মস্ত আহ্বানও আসিতেছে। তরঙ্গগুলা অট্টহাস্যে নৃত্য করিতেছে— ডাঙার মাটির মতো কিছুতেই তাহাদিগকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে নাই। দেখিলে মনে হয়, লক্ষ লক্ষ ইস্কুলের ছেলে যেন ছুটি পাইয়াছে—চিৎকার করিয়া, মাতামাতি করিয়া, কিছুতেই তাহাদের আশ মিটিতেছে না; পৃথিবীটাকে তাহারা যেন ফুটবলের গোলার মতো লাথি ছুড়িয়া ছুড়িয়া আকাশে উড়াইয়া দিতে চায়। ইহা দেখিয়া মানুষের মন তীরে বসিয়া শান্ত হইয়া পড়িয়া থাকিতে পারে না। সমুদ্রের এই মাতুনি মানুষের রক্তের মধ্যে করতাল বাজাইতে থাকে। বাধাহীন জলরাশির এই দিগন্তবিস্তৃত মুক্তিকে মানুষ আপন করিতে চায়। সমুদ্রের এই দূরত্বজয়ী আনন্দের প্রতি মানুষ লোভ দিতে লাগিল। ঢেউগুলার মতো করিয়াই দিগন্তকে লুঠ করিয়া লইবার জন্য মানুষের কামনা।

কিন্তু, এমন অদ্ভুত সাধ মিটিবে কী করিয়া? এই তীরের রেখাটা পর্যন্ত মানুষের অধিকারের সীমা— তাহার সমস্ত ইচ্ছাটাকে এই দাঁড়ির কাছে আসিয়া শেষ করিতে হইবে। কিন্তু, মানুষের ইচ্ছাকে যেখানে শেষ করিতে চাওয়া যায় সেইখানেই সে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। কোনোমতেই সে বাধাকে চরম বলিয়া মানিতে চাহিল না।

অবশেষে একদিন বুনো ঘোড়াটার মতোই সমুদ্রের ফেনকেশর ধরিয়া মানুষ তাহার পিঠের উপর চড়িয়া বসিল। ক্রুদ্ধ সাগর পিঠ নাড়া দিল; মানুষ কত ডুবিল, কত মরিল, তাহার সীমা নাই। অবশেষে একদিন মানুষ এই অবাধ্য সাগরকেও আপনার সঙ্গে জুড়িয়া লইল। তাহার এক কূল হইতে আর-এক কূল পর্যন্ত মানুষের পায়ের কাছে আসিয়া মাথা হেঁট করিয়া দিল।

বিশাল সমুদ্রের সঙ্গে যুক্ত মানুষটা যে কীরকম, আজ আমরা জাহাজে চড়িয়া তাহাই অনুভব করিতেছি। আমরা তো এই একটুখানি জীব, তরণীর এক প্রান্তে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছি, কিন্তু দূর দূর বহুদূর পর্যন্ত সমস্ত আমার সঙ্গে মিলিয়াছে। যে দূরকে আজ রেখামাত্রও দেখিতে পাইতেছি না তাহাকেও আমি এইখানে স্থির দাঁড়াইয়া অধিকার করিয়া লইয়াছি। যাহা বাধা তাহাই আমাকে পিঠে করিয়া লইয়া অগ্রসর করিয়া দিতেছে। সমস্ত সমুদ্র আমার, যেন আমারই বিরাট শরীর, যেন তাহা আমার প্রসারিত ডানা। যাহা-কিছু আমাদের বাধা তাহাকেই আমাদের চলিবার পথ, আমাদের মুক্তির উপায় করিয়া লইতে হইবে, আমাদের প্রতি ঈশ্বরের এই আদেশ আছে। যাহারা এই আদেশ মানিয়াছে তাহারাই পৃথিবীতে ছাড়া পাইয়াছে। যাহারা মানে নাই এই পৃথিবীটা তাহাদের পক্ষে কারাগার। নিজের গ্রামটুকু তাহাদিগকে বেড়িয়াছে, ঘরের কোণটুকু তাহাদিগকে বাঁধিয়াছে, প্রত্যেক পা ফেলিতেই তাহাদের শিকল ঝমঝম করে।

মনের আনন্দে চলিতেছি। ভয় ছিল, সমুদ্রের দোলা আমার শরীরে সহিবে না। সে ভয় কাটিয়া গেছে। যেটুকু নাড়া খাইতেছি তাহাতে আঘাত করিতেছে না, যেন আদর করিতেছে। সমুদ্র আমাকে কোলে করিয়া বহিয়া চলিয়াছে— রুগ্ণ বালককে তাহার পিতা যেমন করিয়া লইয়া যায় তেমনি সাবধানে। এইজন্য এ যাত্রায় এখন পর্যন্ত আমার চলিবার কোনো পীড়া নাই, চলিবার আনন্দই ভোগ করিতেছি।

কেবলমাত্র এই চলিবার আনন্দটুকুই পাইব বলিয়া আমি বাহির হইয়াছি। অনেক দিন হইতে এই চলিবার, এই বাহির হইয়া পড়িবার, একটা বেগ আমাকে উতলা করিয়া তুলিতেছিল! অনেক দিন আমাদের আশ্রমের

বাড়িতে দোতলার বারান্দায় একলা বসিয়া যখন আমাদের সামনের শালগাছগুলার উপরের আকাশের দিকে তাকাইয়াছি, তখন সেই আকাশ দূরের দিকে তাহার তর্জনী বাড়াইয়া দিয়া আমাকে সংকেত করিয়াছে। যদিও সেই আকাশটি নীরব, তবু দেশ-দেশান্তরের যত অপরিচিত গিরিনদী-অরণ্যের আহ্বান কত দিগ্‌দিগন্তর হইতে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়া এই আকাশের নীলিমাকে পরিপূর্ণ করিয়াছে। নিঃশব্দ আকাশ বহু দূরের সেই-সমস্ত মর্মরধ্বনি, সেই-সমস্ত কলগুঞ্জন, আমার কাছে বহন করিয়া আনিত। আমাকে কেবলই বলিত, 'চলো, চলো, বাহির হইয়া এসো।' সে কোনো প্রয়োজনের চলা নহে, চলার আনন্দেই চলা।

প্রাণ আপনি চায় চলিতে; সেই তাহার ধর্ম। না চলিলে সে যে মৃত্যুতে গিয়া ঠেকে। এইজন্য নানা প্রয়োজনের ও খেলার ছুতায় সে কেবল চলে। পদ্মার চরে শরতের সময়ে তো হাঁসের দল দেখিয়াছ। তাহারা কোন দুর্গম হিমালয়ের শিখরবেষ্টিত নির্জন সরোবরতীরের নীড় ছাড়িয়া কত দিনরাত্রি ধরিয়া উড়িতে উড়িতে এই পদ্মার বালুতটের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। শীতের দিনে বাষ্পে বরফে ভীষণ হইয়া উঠিয়া হিমালয় তাহাদিগকে তাড়া লাগাইয়া দেয়—তাহারা বাসাবদল করিতে চলে। সুতরাং সেই সময়ে হাঁসেদের পক্ষে দক্ষিণপথে যাত্রার একটা প্রয়োজন আছে বটে। কিন্তু, তবু সেই প্রয়োজনের অধিক আর একটা জিনিস আছে। এই-যে বহু দূরের গিরিনদী পার হইয়া উড়িয়া যাওয়া, ইহাতে এই পাখিদের ভিতরকার প্রাণের বেগ আনন্দলাভ করে। ক্ষণে ক্ষণে বাসাবদল করিবার ডাক পড়ে, তখনি সমস্ত জীবনটা নাড়া খাইয়া আপনাকে আপনি অনুভব করিবার সুযোগ পায়।

আমার ভিতরেও বাসাবদল করিবার ডাক পড়িয়াছিল। যে বেষ্টনের মধ্যে বসিয়া আছি সেখান হইতে আর-একটা কোথাও যাইতে হইবে। চলো, চলো, চলো। ঝরনার মতো চলো, সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো চলো, প্রভাতের পাখির মতো চলো, অরুণোদয়ের আলোর মতো চলো। সেইজন্যই তো পৃথিবী এমন বৃহৎ, জগৎ এমন বিচিত্র, আকাশ এমন অসীম। সেইজন্যই তো বিশ্ব জুড়িয়া অণু-পরমাণু নৃত্য করিতেছে এবং অগণ্য নক্ষত্রলোক আপন-আপন আলোকের শিবির লইয়া প্রান্তরচারী বেদুইনদের মতো আকাশের ভিতর দিয়া যে কোথায় চলিয়াছে তাহার ঠিকানা নাই। চিরকালের মতো কোনো একই জায়গায় বাসা বাঁধিয়া বসিব, বিশ্বের এমন ধর্মই নহে। সেইজন্যই মৃত্যুর ডাক আর-কিছুই নহে, সেই বাসাবদলের ডাক। জীবনকে কোনোমতেই সে কোনো সনাতন প্রাচীরের মধ্যে বদ্ধ হইয়া থাকিতে দিবে না— জীবনকে সেই জীবনের পথে অগ্রসর করিবে বলিয়াই মৃত্যু।

তাই আমি আজ চলিয়াছি; রূপকথার রাজপুত্র যেমন হঠাৎ একদিন অকারণে সাত সমুদ্র পার হইবার জন্য বাহির হইয়া পড়িত, তেমনি করিয়া আমি আজ বাহিরে চলিয়াছি। রাজকন্যা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, সে ঘুম ভাঙে না; সোনার কাঠি চাই। একই জায়গায় একই প্রথার মধ্যে বসিয়া বসিয়া জীবনের মধ্যে জড়তা আসে; সে অচেতন হইয়া পড়ে; সে কেবল আপনার শয্যাটুকুকেই আঁকড়িয়া থাকে; এই বৃহৎ পৃথিবীকে বোধ করিতেই পারে না; তখন সোনার কাঠি খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে; তখনি দূরে পাড়ি দেওয়া চাই; তখন এমন একটা চেতনার দরকার যাহা আমাদের চোখের কানের মনের রুদ্ধ দ্বারে কেবলই নূতন নূতন নূতনের আঘাত দিতে থাকিবে—যাহা আমাদের জীর্ণ পর্দাটাকে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া চিরনূতনকে উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিবে। কী বৃহৎ, কী সুন্দর, কী উন্মুক্ত এই জগৎ! কী প্রাণ, কী আলোক, কী আনন্দ! মানুষ এই পৃথিবীকে ঘিরিয়া ফেলিয়া কত রকম করিয়া দেখিতেছে, ভাবিতেছে, গড়িতেছে! তাহার প্রাণের, তাহার মনের, তাহার কল্পনার লীলাক্ষেত্র কোনোখানে ফুরাইয়া গেল না। পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া মানুষের এই-যে মনোলোক ইহার কী অফুরান ও অদ্ভুত বৈচিত্র্য। সেই-সমস্তকে লইয়াই যে আমার এই পৃথিবী। এই জন্যই এই-সমস্তটিকে একবার প্রদক্ষিণ করিয়া প্রত্যক্ষ দেখিবার জন্য মনের মধ্যে আহ্বান আসে।

এই বিপুল বৈচিত্র্যকে তন্ন তন্ন করিয়া নিঃশেষে দেখিবার সাধ্য ও অবকাশ কাহারও নাই। বিশ্বকে দর্শন করিব বলিয়া তাহার সম্মুখে বাহির হইতে পারিলেই দর্শনের ফল পাওয়া যায়। যদিও এক হিসাবে বিশ্ব সর্বত্রই আছে, তবু আলস্য ছাড়িয়া, অভ্যাস কাটাইয়া, চোখ মেলিয়া, যাত্রা করিলে তবেই আমাদের দৃষ্টিশক্তির জড়িমা কাটিয়া যায় এবং আমাদের প্রাণ উদ্‌বোধিত হইয়া বিশ্বপ্রাণের স্পর্শ উপলব্ধি করে। যে নিশ্চল, যে নিরুদ্যম সে লোক সেই জিনিসকেই হারাইয়া বসে—যাহা একেবারেই হাতের কাছে আছে। তাই নিকটের ধনকে দুঃখ করিয়া দূরে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিলেই, তাহাকেই অত্যন্ত নিবিড় করিয়া পাওয়া যায়। আমাদের সমস্ত ভ্রমণেরই ভিতরকার আসল উদ্দেশ্যটি এই—যাহা আছেই, যাহা হারাইতে পারেই না, তাহাকেই কেবলই প্রতি পদে 'আছে আছে আছে' বলিতে বলিতে চলা— পুরাতনকে কেবলই নূতন নূতন নূতন করিয়া সমস্ত মন দিয়া ছুঁইয়া ছুঁইয়া যাওয়া।

লোহিতসমুদ্র

২১ জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৯

অধ্যয়ন ও জ্ঞানলাভ

প্রফুল্লচন্দ্র রায়

আমি এখন নিজেকে ছাত্র বলে গণ্য করি। ওই জীবন ত্যাগ করে একদিনও অন্য জীবনে পদার্পণ করেছি বলে মনে হয় না। 'ছাত্রাণাং অধ্যায়নং তপঃ'—বাস্তবিক এই ঋষিবাক্য বড়ো সত্য—বড়ো সার কথা। আর আমাদের এই ছাত্রজীবনের গার্হস্থ্যজীবনের পার্থক্যের প্রাচীর বড়ই অমঙ্গলকর।

ইউরোপীয় অবস্থাপন্ন লোকের একটি স্টাডি অর্থাৎ পাঠাগার থাকে। সেখানে প্রবেশ করবার অর্থ এই—যেন কেউ না দেখে বা ঢোকে। যেমন আমাদের দেশের ঠাকুরঘর। ভক্ত সেখানে আপন মনে সাধনা করেন, হৃদয়দেবতাকে ভক্তির অর্ঘ্য দান করেন—কিন্তু তা লোকচক্ষুর অন্তরালে—আর কেহ দেখে না। আমাদের পাঠাগারকে ঠাকুরঘরের পবিত্রতায় মণ্ডিত করতে হবে, তাকে নিভৃতে স্থাপন করতে হবে—যেন চপলতার গোলমাল সেখানে না পৌঁছায়।

আমাদের দেশে অনেক ছাত্র বাড়িতে থাকেন, আবার অনেক মেসে থাকেন। এখানে ছাত্রের প্রধান বিপদ এই যে তার কোনো স্বতন্ত্র পাঠাগার থাকে না। বড়ো লোকে বড়ো বাড়িতে থাকেন—নানাকার্যের বন্দোবস্তের

জন্য তাঁদের অনেক ব্যয় করতে হয়। কিন্তু বাড়ির ছেলে কীরূপে কোলাহলের বাইরে নির্জনে বসে পড়বে সাধারণত কোনো বাড়িতেই তার বন্দোবস্ত থাকে না—এরূপ বন্দোবস্ত যে থাকা দরকার তাও ভালো করে উপলব্ধি করেন না। আর মেসের তো কথাই নেই। আমাদের দেশে কথা আছে—'একে উসখুস দুয়ে পাঠ, তিনে গণ্ডগোল চারে হাট।' মেসে অনেক একত্র জোটে—কাজেই প্রত্যেকে হাটের মধ্যে গিয়ে পড়ে। হাটে হয় হট্টগোল, সরস্বতী সেখানে টিকতে পারেন না; মন্দিরে যেরূপ ভক্তের জপতপ আরাধনা—পাঠাগারে সেইরূপ ছাত্রের অধ্যয়ন ও সাধনা। ছাত্রের প্রধান কর্তব্য অধ্যয়ন; আর এই অধ্যয়ন তপস্যা ব্যতীত আর কিছু নয়। একাগ্রচিত্ততা এই তপস্যায় সিদ্ধি দান করে।

প্রথমে কথা এই যে—কী করে পড়তে হয়? ক-ঘণ্টা পড়ো তার হিসাব রাখবার দরকার নেই, কীরূপ একাগ্রতার সহিত অধ্যয়ন করো সেটাই সবার চেয়ে দরকারি জিনিস। পড়াশুনার উদ্দেশ্য সফল করতে হলে—ঘণ্টার উপর নয়—একাগ্রতার উপর নির্ভর করতে হয়। আমি আজ সকালে 'খুব' পড়েছি—কিন্তু মোটে একঘণ্টা কী তার কিছু বেশি। এইভাবে আমি রোজই পড়ি, তা রবিবার নেই, ছুটিও নেই, অবকাশও নেই। এইভাবে সমানে (নিষ্ঠা ও একাগ্রতার সহিত) পড়ে যেতে হবে। কিন্তু এদেশে ছাত্রদের প্রধান বিপদ গল্প, খেলা আর আড্ডা। একাগ্রতার তো সম্পূর্ণই অভাব; তার উপর খেয়াল ও হুজুগে, পড়বার সবসময়টা কেটে যায়। পরে যখন পরীক্ষা কাছে এগিয়ে আসে তখন আহার, নিদ্রা ত্যাগ করে, রাত্রি জাগরণে স্বাস্থ্য নষ্ট করে তার জন্য প্রস্তুত হবার বিপুল প্রয়াস। একে লেখাপড়া বলে না, এ লেখাপড়া নয়, এ ইউনিভারসিটিকে ফাঁকি। কেবল মুখস্থ আর উদরস্থ; পেটুকের মিষ্টান্ন ভক্ষণের মতো—একমন সন্দেশ টপাটপ করে গেলা, তারপর গলায় আঙুল দিয়ে বমি। সব সময়টা ফাঁকি দিয়ে পরীক্ষা কাছে এলেই টপাটপ মুখস্থ আর উদরস্থ করবার প্রয়াস; তারপর পরীক্ষামন্দিরে গিয়ে একেবারে বমি। পরীক্ষার পরই সরস্বতীর সঙ্গে সম্পর্ক লোপ। আর পাশ হলে 'হকার' চাচার দোকানে পুস্তক বিসর্জন। মনে পড়ে ছেলেবেলায় জ্বর হত, আর কেবল মিছরি, বেদানা ও কুইনিন খেতে হত। বাল্যজ্বর মনে করিয়ে দেয় বলে ওই জিনিসগুলোয় আমার একটা ভয়ানক বিতৃষ্ণা আছে—ওগুলো আমার কাছে বিভীষিকা! পাশ করবার পর এদেশের ছাত্রদের পুস্তকের উপর ঠিক ওই রকমই তীব্র বিতৃষ্ণা হয়—বইগুলো তাদের কাছে আতঙ্ক উপস্থিত করে। পুস্তককে আজীবন সঙ্গী করতে হবে, কিন্তু আশ্চর্য এই যে পরীক্ষার পর বই আর পাবার জো নাই! শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় একবার কোনো ছাত্রকে বলেছিলেন, 'ব্ল্যাকীর "সেলফ-কালচার" বইখানা দাও তো।' সে জবাব দিলে, 'সে বই তালা বন্ধ, দেখলে ভয় হয়।' এ বড়ো দুঃখের কথা। সৎপুস্তককে আজীবন সহচর করতে হবে, আজীবন ধরে সৎপুস্তক পাঠে ভাব সংগ্রহ করতে হবে, হৃদয়ে উদ্দীপনা জাগিয়ে রাখতে হবে এবং প্রকৃত জ্ঞানের অনুশীলন করতে হবে। ইংরেজ কবি সাদি পুস্তককে লক্ষ্য করে যথার্থই বলেছেন—

"The mighty minds of old"

* * * *

"My never-failing friends are they."

পুস্তক পাঠের উদ্দেশ্য সফল করতে হলে খুব বেশি বই পড়বার দরকার হয় না। অনেকে যা পায় তাই পড়ে, পরিণত বয়সেও তাদের এই অভ্যাস থেকে যায়। তারা কখনও পুস্তক নির্বাচন করে পড়ে না। ছুটি পেলে তারা অনেক রকমে অনেক পয়সা ব্যয় করবে। বেড়াবার শখ মেটাবার জন্যে দামি পোশাক, ট্রাংক, গ্লাডস্টোন-ব্যাগ কিনবে, কিন্তু ছুটিতে পড়বার জন্যে কী বই সঙ্গে নিয়ে যাবে কখনই তার কিছু স্থির করবে না। হাতে যা পাবে

তাই পড়বে, কিছু বিচার করবে না। বায়রনের পদ্য থেকে এমার্সন বলেন, "He knew not what to say and so he swore"। প্রথম মনে হলো কী পড়বে? খবরের কাগজখানা তুলে নিলাম, আগে খবর পড়লাম, তার পর অন্য কথা পড়া হলো, শেষ বিজ্ঞাপনস্তম্ভ পর্যন্ত নিঃশেষ করা গেল। কী পাওয়া গেল, কী বোঝা গেল, তার কোনো চিন্তা করলাম না। কিন্তু এরকম ঠিক নয়, উদ্দেশ্যবিহীন পাঠ কোনোমতেই ঠিক নয়। সবার আগে পড়বার উদ্দেশ্য খুব ভালো করে বুঝতে হবে, তারপর রুচি অনুসারে পুস্তক নির্বাচন করতে হবে, কারণ সকলের সব বই ভালো লাগে না, কিন্তু একটা উদ্দেশ্য মনে রেখে তারই উপযোগী পুস্তক নির্বাচন করা এদেশের ছাত্রদের মধ্যে নেই বললেই চলে। যে-কোনো লাইব্রেরির কর্তৃপক্ষগণকে যদি জিজ্ঞাসা করে দেখেন, 'পাঠকগণ নভেল নাটকই বা কত পড়েন আর ইতিহাস ও জীবনীই বা কখানা পড়েন,' দেখবেন তৃপ্তিকর উত্তর পাওয়া যাবে না।

কাজের সময় কাজ করতে হয়, খেলার সময় খেলা; তা হলেই মনে আনন্দ ও উৎসাহ থাকে। আমি সর্বদাই কাজ করি, আবার অবসর মতো করি না। একজন বড় ইংরেজ দোকানদার আফিসে একমনে পাঁচ-ছয় ঘণ্টা কঠিন পরিশ্রম করে কাজ করে, কিন্তু যেমনি কাজ শেষ হয় অমনি গঙ্গার ধারে—খোলা মাঠে মুক্ত বাতাসে বেড়াতে যায়। তারা সে সময়ে বসে থাকে না—কুড়েমি করে না,আড্ডা বা মজলিসে জমে না। কিন্তু আমরা স্বাস্থ্য রাখতে জানি না, সময়ে কাজ করি না, তাই শরীর ও সময় দুইয়েরই অপব্যবহার হয়; স্বাস্থ্যও থাকে না, কাজও ওঠে না।

এদেশে শুধুই বই পড়িয়ে বিদ্যা শেখানো হয়। কিন্তু ইউরোপে সাধারণ পুস্তক পাঠের সঙ্গে প্রকৃতির উন্মুক্ত বিশাল গ্রন্থ পাঠ করে জ্ঞানার্জন করবার প্রবৃত্তি জাগিয়ে দেওয়া হয়। শুধু বই পড়ে কত শেখা যায়? নিজের চেষ্টায় বিশ্বরাজ্যের নানাপ্রকার অদ্ভুত ঘটনা নিপুণচক্ষে পর্যবেক্ষণ করতে হয়, তবেই প্রকৃত জ্ঞানার্জন হয়। পুঁথিগত বিদ্যার দৌড় কখনই বেশি হয় না। বিখ্যাত ঔপন্যাসিক ডিকেন্স সময়ে সময়ে ছদ্মবেশে মদের দোকানে গিয়ে বসে থাকতেন। উদ্দেশ্য মাতালের কথাবার্তা শুনে তার প্রকৃতি বুঝে দেখা। এই ভাবে নানা রকমে বিখ্যাত ইউরোপীয়েরা মানবপ্রকৃতি নিখুঁত করে জানবার চেষ্টা করেন। এ-ই প্রকৃত অধ্যয়ন। মানবপ্রকৃতির পর জড়প্রকৃতি। পর্যবেক্ষণের দ্বারা তাও বুঝতে হবে।

জুলজিক্যাল গার্ডেনে ইউরোপীয়েরা নানা রকম পশুপাখি কীটপতঙ্গ প্রভৃতির জীবনযাপন-প্রণালী অধ্যয়ন করেন। ফরাসি দেশের একজন উকিল কুড়ি বৎসর ধরে শুঁয়াপোকা ও প্রজাপতি কেমন করে এক থেকে অপরে পরিণত হয় তা পর্যবেক্ষণ করেছেন, আর তার একটি কৌতূহলপ্রদ বিবরণ লিপিবন্ধ করেছেন। এ ছাড়া তিনি নিজের চোখে গুটি ও তুঁতপোকার জীবনযাত্রা দেখে ওইসকল কীট থেকে রেশম উৎপন্ন করা সম্বন্ধে অনেক আবশ্যকীয় নূতন কথা সভ্যজগৎকে জানিয়েছেন।

ইংরেজ ও আমেরিকানের এক-একটা Hobby অর্থাৎ খেয়াল আছে। কেউ গার্ডেনিং করেন, বাগানে নানারকম ফলফুল উৎপন্ন করেন। এ একটা সুন্দর খেয়াল। কেউ বা প্রাণীতত্ত্ব অধ্যয়ন করেন, আবার কেউ বা পতঙ্গবিজ্ঞান (Entomology) সম্বন্ধে আলোচনা করেন। আমাদের ভূতপূর্ব গবর্নর লর্ড কারমাইকেল নিজে পতঙ্গ সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন।

এদেশে গবর্নমেণ্ট পুনা কৃষি কলেজে লেফ্রয় (Lefroy) নামক একজন মস্ত পতঙ্গবিজ্ঞানবিদ (Entomologist)-কে আনিয়াছেন। তিনি কোন কোন পতঙ্গ শস্য নষ্ট করে সে সম্বন্ধে আলোচনা করছেন। আমরা জানি শুধু পঙ্গপালই ফসল নষ্ট করে দেয়; কিন্তু আরও অনেকরকম পতঙ্গ আছে যারা ফসলের বড়ো কম ক্ষতি করে না। ইনি তাদেরই জীবনচরিত আলোচনা করছেন আর কীসে তাদের নষ্ট করে শস্য বাঁচানো যায়

তার উপায় আবিষ্কার করবার চেষ্টা করছেন। এই সকল ব্যাপারের আলোচনা ও অধ্যয়ন আমাদের ব্যবসা ও ধনাগম সম্বন্ধে অনেক সাহায্য করে। যাঁরা পতঙ্গবিজ্ঞান অধ্যয়ন করেছেন, তাঁরা কী করে তুঁতপোকাকে রোগের হাত থেকে রক্ষা করে বর্ধিত করতে হয় তা জানেন। গুটিপোকার রোগ হলে তা থেকে ভালো রেশম হয় না। ফ্রান্সে 'Disease of Silk-worm' অর্থাৎ গুটিপোকার রোগ সম্বন্ধে পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। সেই বই পড়ে যাঁরা রেশমের চাষ করেন, তাঁরা গুটিপোকাকে বর্ধিত করবার নানারকম উপায় জানতে পেরেছেন, আর সেই কারণে রেশমের চাষে খুব লাভবান হয়েছেন। আর আমাদের দেশে মুর্শিদাবাদ ও বহরমপুরে — সেখানে রেশমের চাষ দিন দিন উঠে যাচ্ছে; কারণ আমরা ওই কাজ অজ্ঞ চাষাদের হাতে ফেলে রেখে দিয়েছি, যাদের গুটিপোকা সম্বন্ধে খুব বেশি কিছু জ্ঞান নেই।

এই সমস্ত কারণেই বলছি যে শেখবার অনেক আছে, শুধু কেতাব পড়লেই হয় না। আমি অ্যালবার্ট স্কুলে পড়তাম। সেখানে প্রত্যেক শনিবার কেশব সেনের বক্তৃতা হতো। তিনি এক সময়ে বলেছিলেন, 'বাঙালির ছেলের লেখাপড়া শেখা যেন বালিশের খোলে তুলো পুরে দেওয়া; কেবল ঠাসা আর গাদা।' তার উপরে অভিভাবক সর্বনাশ করছেন — স্কুলের ছুটি হলেই মাস্টারবাবুকে ছেলের পিছনে লেলিয়ে দেবেন, ছেলে বিদ্যে শিখবে। এঁরা হচ্ছেন murderer of boys অর্থাৎ বালকহন্তা; কারণ স্কুলের ছুটির পর অন্তত দুই বা আড়াই ঘণ্টা খেলা চাই। সে সময়টা খোলা মাঠে ছোটো, দৌড়াও, লাফাও, নদীতে নৌকা বাও। তবে তো স্বাস্থ্য থাকবে, মনে প্রফুল্লতা আসবে। তা নয় বাড়ি এসেই কেতাব নিয়ে বসো। তারপর কোন ছেলে কোন বিষয়ে backword অর্থাৎ কাঁচা, অমনি প্রাইভেট টিউটর লাগাও, — ইংলিশে একটি, সংস্কৃতে একটি, সব বিষয়ে একটি-একটি। টিউটরের ঠেলায় বেচারি ছাত্র একেবারে dull অর্থাৎ গাধা হয়ে ওঠে, নিজে ভাববার বা নিজের উপর নির্ভর করবার শক্তি তার একেবারে লোপ পায়। তাই বলি এ প্রথার অনেক দোষ! এমার্সন বলেন, 'Guardians are benefactors but sometimes they act like the worst malefactors,' — অভিভাবকগণ ছেলের উপকার করেন বটে, কিন্তু সময়ে-সময়ে ভয়ংকর অপকারসাধন করে থাকেন। বেশি পড়লেই বিদ্যে হয় না, আমি আজীবন ধরে সামান্য একটি বিদ্যা আয়ত্ত করবার চেষ্টা করছি, কিন্তু পাঠ ওই একঘণ্টা।

আমাদের বাঙালির ছেলের জীবন যেন একটা ভার বওয়া। বেদান্ত মতে জীবন কিছুই নয়। দু-হাজার বছর ধরে আমরা চিরকাল শুনে আসছি, জীবন মানে কিছুই নয় — নলিনীদলগতজলমিব — এর একটা প্রভাব জাতীয় চরিত্রে তো আছেই। আমরা সকলেই খানিকটা স্বীকার করে নিই যে জীবন একটা দুর্বহ ভার। তার উপরে আবার এই ভয়ংকর জীবনসংগ্রাম। সকালে আটটার সময় বাড়ি থেকে দৌড়োদৌড়ি করে ম্যালেরিয়া-জীর্ণ শরীরখানি নিয়ে ডেলি প্যাসেঞ্জারি করা অর্থাৎ কলম-পিষে জীবিকা-অর্জনের জন্য শহরের দিকে ছুটোছুটি করা। দিন যে কোথা দিয়ে চলে যায়, দুর্ভাগ্য বাঙালি তা জানতে পারে না — পৃথিবীর কোনো আনন্দই সে উপভোগ করে না। আকাশের উন্মুক্ততা, আলোকের হাসি বা বাতসের সুখময় স্পর্শ কিছুই তার প্রাণে সজীবতা ও নবীনতা আনয়ন করে না। লাবকের 'জীবনের সুখ' নামের একখানি পুস্তক আছে। ওই পুস্তকে তিনি বলছেন — জীবন কি শুধু ঔষধ গেলা? জীবনে আনন্দ উপভোগই বিধাতার উদ্দেশ্য। কিন্তু আমরা কর্মদোষে সেই উদ্দেশ্য বিফল করি। পাখি গায় কেন, প্রজাপতি মধু আহরণ করে কেন, যদি বিধাতার সৃষ্টিতে আনন্দ না থাকে।

(সংক্ষেপিত ও সম্পাদিত)

ইন্দ্রনাথ ও শ্রীকান্ত

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ইন্দ্র আমার দিকে চাহিয়া কহিল, তুই বুঝি এই বাড়িতে থাকিস শ্রীকান্ত?

আমি কহিলাম, হ্যাঁ। তুমি এত রাত্তিরে কোথায় যাচ্চ?

ইন্দ্র হাসিয়া কহিল, রাত্তির কোথায় রে, এই ত সন্ধ্যা। আমি যাচ্ছি আমার ডিঙিতে– মাছ ধরে আনতে। যাবি?

আমি সভয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম, এত অন্ধকারে ডিঙিতে চড়বে?

সে আবার হাসিল। কহিল, ভয় কী রে! সেই তো মজা। তা ছাড়া অন্ধকার না হ'লে কি মাছ পাওয়া যায়? সাঁতার জানিস?

খুব জানি।

তবে আয় ভাই! বলিয়া সে আমার একটা হাত ধরিল। কহিল, আমি একলা এত স্রোতে উজোন বাইতে পারিনে– একজন কাউকে খুঁজি, যে ভয় পায় না।

আমি আর কথা কহিলাম না। তাহার হাত ধরিয়া নিঃশব্দে রাস্তার উপর আসিয়া উপস্থিত হইলাম। প্রথমটা আমার নিজেরই যেন বিশ্বাস হইল না–আমি সত্যিই এই রাতে নৌকায় চলিয়াছি। কারণ, যে আহ্বানে এই স্তব্ধ-নিবিড় নিশীথে এই বাড়ির সমস্ত কঠিন শাসনপাশ তুচ্ছ করিয়া দিয়া, একাকী বাহির হইয়া আসিয়াছি, সে যে কত বড়ো আকর্ষণ, তাহা তখন বিচার করিয়া দেখিবার আমার সাধ্য ছিল না। অনতিকাল পরে

গোঁসাইবাগানের সেই ভয়ঙ্কর বনপথের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম এবং ইন্দ্রকে অনুসরণ করিয়া স্বপ্নাবিষ্টের মতো তাহা অতিক্রম করিয়া গঙ্গার তীরে আসিয়া দাঁড়াইলাম।

খাঁড়া কাঁকরের পাড়। মাথার উপর একটা বহু প্রাচীন অশ্বত্থবৃক্ষ মূর্তিমান অন্ধকারের মতো নীরবে দাঁড়াইয়া আছে এবং তাহার প্রায় ত্রিশ হাত নীচে সূচিভেদ্য আঁধারতলে পরিপূর্ণ বর্ষার গভীর জলস্রোত ধাক্কা খাইয়া আবর্ত রচিয়া উদ্দাম হইয়া ছুটিয়াছে। দেখিলাম, সেইখানে ইন্দ্রের ক্ষুদ্র তরীখানি বাঁধা আছে। উপর হইতে মনে হইল, সেই সুতীব্র জলধারার মুখে একখানি ছোট্ট মোচার খোলা যেন নিরন্তর কেবলই আছাড় খাইয়া মরিতেছে।

আমি নিজেও নিতান্ত ভীরু ছিলাম না। কিন্তু ইন্দ্র যখন উপর হইতে নীচে একগাছি রজ্জু দেখাইয়া কহিল, ডিঙির এই দড়ি ধ'রে পা টিপে টিপে নেবে যা, সাবধানে নাবিস, পিছলে পড়ে গেলে আর তোকে খুঁজে পাওয়া যাবে না; তখন যথার্থই আমার বুক কাঁপিয়া উঠিল। মনে হইল, ইহা অসম্ভব। কিন্তু তথাপি আমার তো দড়ি অবলম্বন আছে, কিন্তু তুমি?

সে কহিল, তুই নেবে গেলেই আমি দড়ি খুলে দিয়ে নাব্‌ব। ভয় নেই আমার নেবে যাবার অনেক ঘাসের শিকড় ঝুলে আছে।

আর কথা না কহিয়া আমি দড়িতে ভর দিয়া অনেক যত্নে অনেক দুঃখে নীচে আসিয়া নৌকায় বসিলাম। তখন দড়ি খুলিয়া দিয়া ইন্দ্র ঝুলিয়া পড়িল। সে যে কী অবলম্বন করিয়া নামিতে লাগিল, তাহা আজও আমি

জানি না। ভয়ে বুকের ভিতরটা এমনি টিপটিপ করিতে লাগিল যে, তাহার পানে চাহিতে পারিলাম না! মিনিট দুই-তিন কাল বিপুল জলধারার মত্তগর্জন ছাড়া কোনো শব্দমাত্র নাই। হঠাৎ ছোট্ট একটুখানি হাসির শব্দে চকিত হইয়া মুখ ফিরাইয়া দেখি, ইন্দ্র দুই হাত দিয়া নৌকা সজোরে ঠেলিয়া দিয়া লাফাইয়া চড়িয়া বসিল। ক্ষুদ্র তরী তীব্র একটা পাক খাইয়া নক্ষত্রবেগে ভাসিয়া চলিয়া গেল।

দুই

কয়েক মুহূর্তেই ঘনান্ধকারে সম্মুখ এবং পশ্চাৎ লেপিয়া একাকার হইয়া গেল। রহিল শুধু দক্ষিণ ও বামে সীমান্তরাল প্রসারিত বিপুল উদ্দাম জলস্রোত এবং তাহারই উপর তীব্রগতিশীলা এই ক্ষুদ্র তরণীটি এবং কিশোরবয়স্ক দুটি বালক। প্রকৃতিদেবীর সেই অপরিমেয় গম্ভীর রূপ উপলব্ধি করিবার বয়স তাহাদের নহে, কিন্তু সে কথা আমি আজও ভুলিতে পারি নাই। বায়ুলেশহীন, নিষ্কম্প, নিস্তব্ধ, নিঃসঙ্গ নিশীথিনীর সে যেন এক বিরাট কালীমূর্তি। নিবিড় কালো চুলে দ্যুলোক ও ভুলোক আচ্ছন্ন হইয়া গেছে, এবং সেই সূচিভেদ্য অন্ধকার বিদীর্ণ করিয়া করাল দংষ্ট্রারেখার ন্যায় দিগন্তবিস্তৃত এই তীব্র জলধারা হইতে কী এক প্রকারের অপরূপ স্তিমিত দ্যুতি নিষ্ঠুর চাপা হাসির মত বিচ্ছুরিত হইতেছে। আশেপাশে সম্মুখে কোথাও বা উন্মত্ত জলস্রোত গভীর তলদেশে ঘা খাইয়া উপরে ফাটিয়া পড়িতেছে, কোথাও বা প্রতিকূল গতি পরস্পরের সংঘাতে আবর্ত রচিয়া পাক খাইতেছে, কোথাও বা অপ্রতিহত জলপ্রবাহ পাগল হইয়া ধাইয়া চলিয়াছে।

আমাদের নৌকা কোনাকুনি পাড়ি দিতেছে, এইমাত্র বুঝিয়াছি। কিন্তু পরপারের ওই দুর্ভেদ্য অন্ধকারের কোনখানে যে লক্ষ্য স্থির করিয়া ইন্দ্র হাল ধরিয়া নিঃশব্দে বসিয়া আছে তাহার কিছুই জানি না। এই বয়সেই সে যে কত বড়ো পাকা মাঝি, তখন তাহা বুঝি নাই। হঠাৎ সে কথা কহিল, কী রে শ্রীকান্ত, ভয় করে?

আমি বললাম, নাঃ-

ইন্দ্র খুশি হইয়া কহিল, এই ত চাই—সাঁতার জানলে আবার ভয় কীসের! প্রত্যুত্তরে আমি একটি ছোট্ট নিশ্বাস চাপিয়া ফেলিলাম—পাছে সে শুনিতে পায়। কিন্তু এই গাঢ় অন্ধকার রাত্রিতে, এই জলরাশি এবং এই

দুর্জয় স্রোতের সঙ্গে সাঁতার জানা, এবং না-জানার পার্থক্য যে কী, তাহা ভাবিয়া পাইলাম না। সেও আর কোনো কথা কহিল না। বহুক্ষণ এইভাবে চলার পরে কী একটা যেন শোনা গেল—অস্ফুট এবং ক্ষীণ; কিন্তু নৌকা যত অগ্রসর হইতে লাগিল, ততই সে শব্দ স্পষ্ট এবং প্রবল হইতে লাগিল। যেন বহুদূরাগত কাহাদের ক্রুদ্ধ আহ্বান। যেন কত বাধাবিঘ্ন ঠেলিয়া ডিঙাইয়া সে আহ্বান আমাদের কানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে—এমনি শ্রান্ত, অথচ বিরাম নাই, বিচ্ছেদ নাই—ক্রোধ যেন তাহাদের কমেও না, বাড়েও না, থামিতেও চাহে না। মাঝে মাঝে এক-একবার ঝুপঝাপ্ শব্দ। জিজ্ঞাসা করিলাম, ইন্দ্র ও কীসের আওয়াজ শোনা যায়? সে নৌকার মুখটা আর একটু সোজা করিয়া দিয়া কহিল, জলের স্রোতে ওপারের বালির পাড় ভাঙার শব্দ।

জিজ্ঞাসা করিলাম, কত বড় পাড়? কেমন স্রোত?

সে ভয়ানক স্রোত। ওঃ, তাইত, কালো জল হয়ে গেছে, আজ তো তার তলা দিয়ে যাওয়া যাবে না। একটা পাড় ভেঙে পড়লে ডিঙিসুদ্ধ আমরা সব গুঁড়িয়ে যাব। তুই দাঁড় টানতে পারিস?

পারি।

তবে টান।

আমি টানিতে শুরু করিলাম। ইন্দ্র কহিল, উই—উই যে কালো মতো বাঁদিকে দেখা যায় ওটা চড়া। ওরি মধ্যে দিয়ে একটা খালের মতো আছে, তারি ভিতর দিয়ে বেরিয়ে যেতে হবে, কিন্তু খুব আস্তে—জেলেরা টের পেলে আর ফিরে আসতে হবে না। লগির ঘায়ে মাথা ফাটিয়ে পাঁকে পুঁতে দেবে।

এ আবার কী কথা! সভয়ে বলিলাম, তবে ওর ভিতর দিয়ে নাই গেলে! ইন্দ্র বোধ করি একটু হাসিয়া কহিল, আর তো পথ নেই। এর মধ্যে দিয়ে যেতেই হবে। বড়ো চড়ার বাঁদিকের রেত ঠেলে জাহাজ যেতে পারে না— আমরা যাব কী ক'রে? ফিরে আসতে পারা যাবে, কিন্তু যাওয়া যাবে না।

তবে মাছ চুরি ক'রে কাজ নেই ভাই, বলিয়া আমি দাঁড় তুলিয়া ফেলিলাম। চক্ষের পলকে নৌকা পাক খাইয়া পিছাইয়া গেল। ইন্দ্র বিরক্ত হইয়া ফিশফিশ করিয়া তর্জন করিয়া উঠিল—তবে এলি কেন? চল তোকে ফিরে রেখে আসি—কাপুরুষ! তখন চোদ্দো পার হইয়া পনেরোয় পরিয়াছি—আমাকে কাপুরুষ? ঝপাৎ করিয়া দাঁড় জলে ফেলিয়া প্রাণপণে টান দিলাম। ইন্দ্র খুশি হইয়া বলিল, এই তো চাই। কিন্তু আস্তে ভাই—ব্যাটারা ভারী পাজি। আমি ঝাউবনের পাশ দিয়ে মক্কাখেতের ভিতর দিয়ে এমনি বার করে নিয়ে যাব যে শালারা টেরও পাবে না। একটু হাসিয়া কহিল, আর টের পেলেই বা কী? ধরা কি মুখের কথা! দেখ শ্রীকান্ত, কিচ্ছু ভয় নেই—ব্যাটাদের চারখানা ডিঙি আছে বটে, কিন্তু যদি দেখিস ঘিরে ফেললে বলে—আর পালাবার জো নেই, তখন ঝুপ করে লাফিয়ে পড়ে এক ডুবে যতদূর পারিস ভেসে উঠলেই হলো। এ অন্ধকারে আর দেখবার জো-টি নাই, তারপর মজা করে সতুয়ার চড়ায় উঠে ভোরবেলায় সাঁতরে এপারে এসে গঙ্গার ধার ধরে বাড়ি ফিরে গেলেই বাস্! কী করবে ব্যাটারা?

চড়াটার নাম শুনিয়াছিলাম; কহিলাম, সতুয়ার চড়া তো ঘোরনালার সমুখে, সে তো অনেক দূর।

ইন্দ্র তাচ্ছিল্যভরে কহিল, কোথায় অনেক দূর? ছ-সাত কোশও হবে না বোধহয়। হাত ভেরে গেলে চিত হ'য়ে থাকলেই হ'ল—তা ছাড়া মড়া-পোড়ানো বড়ো বড়ো গুঁড়ি কত ভেসে যাবে দেখতে পাবি।

আত্মরক্ষার যে সোজা রাস্তা সে দেখাইয়া দিল, তাহাতে প্রতিবাদের আর কিছু রহিল না। এই দিক-চিহ্নহীন অন্ধকার নিশীথে আবর্তসংকুল গভীর তীব্র জলপ্রবাহে সাত ক্রোশ ভাসিয়া গিয়া ভোরের জন্য প্রতীক্ষা

করিয়া থাকা। ইহার মধ্যে আর এদিকের তীরে উঠিবার জো নাই। দশ-পনের হাত খাড়া বালির পাড় মাথায় ভাঙিয়া পড়িবে– এই দিকেই গঙ্গার ভীষণ ভাঙন ধরিয়া জলস্রোত অর্ধবৃত্তাকারে ছুটিয়া চলিয়াছে।

বস্তুটা অস্পষ্ট উপলব্ধি করিয়াই আমার বীরহৃদয় সংকুচিত হইয়া বিন্দুবৎ হইয়া গিয়াছিল। কিছুক্ষণ দাঁড় টানিয়া বলিলাম, কিন্তু আমাদের ডিঙির কী হবে?

ইন্দ্র কহিল, সেদিন তো আমি ঠিক এমনি করেই পালিয়েছিলাম। তার পরদিন এসে ডিঙি কেড়ে নিয়ে গেলাম, বললাম, নৌকা ঘাট থেকে চুরি করে আর কেউ এনেছিল–আমি নয়।

তবে এ-সকল এর কল্পনা নয়–একেবার হাতেনাতে প্রত্যক্ষ করা সত্য! ক্রমশ ডিঙি খাঁড়ির সম্মুখীন হইলে দেখা গেল, জেলেদের নৌকাগুলি সারি দিয়ে খাঁড়ির মুখে বাঁধা আছে– মিটমিট করিয়া আলো জ্বলিতেছে। দুইটি চড়ার মধ্যবর্তী এই জলপ্রবাহটা খালের মত হইয়া প্রবাহিত হইতেছিল। ঘুরিয়া তাহার অপর পাড়ে গিয়া উপস্থিত হইলাম। সে স্থানটায় জলের বেগে অনেকগুলি মোহনার মতো হইয়াছে এবং সব কয়টাকেই বুনো ঝাউগাছে একটা হইতে আর একটাকে আড়াল করিয়া রাখিয়াছে। একটার ভিতর দিয়া খানিকটা বাহিয়া গিয়াই আমরা খালের মধ্যে পড়িলাম। জেলেদের নৌকাগুলো তখন অনেকটা দূরে কালো কালো ঝোপের মতো দেখাইতেছে। আরও খানিকটা অগ্রসর হইয়া গন্তব্যস্থানে পৌঁছানো গেল।

ধীবর প্রভুরা খালের সিংহদ্বার আগুলিয়া আছে মনে করিয়া এ স্থানটায় পাহারা রাখে নাই। ইহাকে মায়াজাল বলে। খালে যখন জল থাকে না তখন এধার হইতে ওধার পর্যন্ত উঁচু উঁচু কাঠি শক্ত করিয়া পুঁতিয়া দিয়া তাহারই বহির্দিকে জাল টাঙাইয়া রাখে। পরে বর্ষার জলস্রোতে বড়ো বড়ো রুই-কাতলা ভাসিয়া আসিয়া এই কাঠিতে বাধা পাইয়া লাফাইয়া ওদিকে পড়িতে চায় এবং দড়ির জাল আবদ্ধ হইয়া থাকে।

দশ, পনেরো, বিশ সের রুই-কাতলা গোটা পাঁচ-ছয় ইন্দ্র চক্ষের নিমেষে নৌকায় তুলিয়া ফেলিল। সেই বিরাটাকার মৎস্যরাজেরা তখন পুচ্ছতাড়নায় ক্ষুদ্র ডিঙিখানা যেন চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া দিবার উপক্রম করিতে লাগিল, এবং তাহার শব্দও বড়ো কম হইল না।

এত মাছ কী হবে ভাই?

কাজ আছে। আর না, পালাই চল। বলিয়া সে জাল ছাড়িয়া দিল। আর দাঁড় টানিবার প্রয়োজন নাই। আমি চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। তখন তেমনি গোপনে আবার সেই পথেই বাহির হইতে হইবে। অনুকূল স্রোতে মিনিট দুই-তিন খরবেগে ভাঁটাইয়া আসিয়া হঠাৎ একস্থানে একটা দমকা মারিয়া যেন আমাদের এই ক্ষুদ্র ডিঙিটি পাশের ভুট্টা খেতের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিল। তাহার এই আকস্মিক গতিপরিবর্তনে আমি চকিত হইয়া প্রশ্ন করিলাম, কী? কী হ'ল?

ইন্দ্র আর একটা ঠেলা দিয়া নৌকাখানা আরও খানিকটা ভিতরে পাঠাইয়া দিয়া কহিল, চুপ! শালারা টের পেয়েছে–চারখানা ডিঙি খুলে দিয়েই এদিক আসচে–ওই দ্যাখ!

তাই তো বটে ! প্রবল জল-তাড়নায় ছপাছপ শব্দ করিয়া চারখানা নৌকা আমাদের গিলিয়া ফেলিবার জন্য যেন কৃষ্ণকায় দৈত্যের মতো ছুটিয়া আসিতেছে। ওদিকে জাল দিয়া বন্ধ, সুমুখে ইহারা। পলাইয়া নিষ্কৃতি পাইবার এতটুকু স্থান নাই। এই ভুট্টা খেতের মধ্যেই যে আত্মগোপন করা চলিবে, তাহাও সম্ভব মনে হইল না।

কী হবে ভাই? বলিতে বলিতেই অদম্য বাষ্পোচ্ছ্বাসে আমার কণ্ঠনালি রুদ্ধ হইয়া গেল। এই অন্ধকারে এই ফাঁদের মধ্যে খুন করিয়া এই খেতের মধ্যে পুঁতিয়া ফেলিলেই বা কে নিবারণ করিবে?

ইতিপূর্বে পাঁচ-ছয় দিন ইন্দ্র 'চুরি বিদ্যা বড়ো বিদ্যা' সপ্রমাণ করিয়া নির্বিঘ্নে প্রস্থান করিয়াছে, এতদিন ধরা পড়িয়াও পড়ে নাই, কিন্তু আজ?

সে মুখে একবার বলিল ভয় নেই। কিন্তু গলাটা তাহার যেন কাঁপিয়া গেল। কিন্তু সে থামিল না। প্রাণপণে লগি ঠেলিয়া ক্রমাগত ভিতরে লুকাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। সমস্ত চড়াটা জলে জলময়। তাহার উপর আট-দশ হাত দীর্ঘ ভুট্টা এবং জনারের গাছ। ভিতরে এই দুটি চোর। কোথাও জল এক বুক, কোথাও এক কোমর, কোথাও হাঁটুর অধিক নয়। উপরে নিবিড় অন্ধকার, সম্মুখে পশ্চাতে দক্ষিণে বামে দুর্ভেদ্য জঙ্গল, পাঁকে লগি পুঁতিয়া যাইতে লাগিল, নৌকা আর একহাতও অগ্রসর হয় না। পিছন হইতে জেলেদের অস্পষ্ট কথাবার্তা কানে আসিতে লাগিল। কিছু একটা সন্দেহ করিয়াই যে তাহারা আসিয়াছে এবং তখনও খুঁজিয়া ফিরিতেছে, তাহাতে লেশমাত্র সন্দেহ নাই।

সহসা নৌকাটা একটু কাত হইয়া সোজা হইল। চাহিয়া দেখি, আমি একাকী বসিয়া আছি, দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই। সভয়ে ডাকিলাম, ইন্দ্র? হাত পাঁচ-ছয় দূরে বনের মধ্যে হইতে সাড়া আসিল, আমি নীচে।

নীচে কেন?

ডিঙি টেনে বের করতে হবে। আমার কোমরে দড়ি বাঁধা আছে।

টেনে কোথায় বার করবে?

ও গঙ্গায়। খানিকটা যেতে পারলেই বড়ো গাঙে পড়ব।

শুনিয়া চুপ করিয়া গেলাম। ক্রমশ ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। অকস্মাৎ কিছুদূরে বনের মধ্যে ক্যানেস্ত্রা পিটানো ও চেরা বাঁশের কটাকট শব্দে চমকাইয়া উঠিলাম। সভয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম, ও কী রে ভাই? সে উত্তর দিল, চাষিরা মাচার উপর বসে বুনো শুয়ার তাড়াচ্চে।

বুনো শুয়ার! কোথায় সে? ইন্দ্র নৌকা টানিতে টানিতে তাচ্ছিল্যভরে কহিল, আমি কি দেখতে পাচ্চি যে বলব? আছেই কোথাও এইখানে। জবাব শুনিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিলাম। ভাবিলাম, কার মুখ দেখিয়া আজ প্রভাত হইয়াছিল। সন্ধ্যারাত্রে আজই ঘরের মধ্যে বাঘের হাতে পড়িয়াছিলাম। এ জঙ্গলে যে বুনো শুয়ারের হাত পড়িব, তাহাতে আর বিচিত্র কী? তথাপি আমি তো নৌকায় বসিয়া; কিন্তু ওই লোকটি একবুক কাদা ও জলের মধ্যে এই বনের ভিতরে। এক পা নড়িবাব-চড়িবার উপায় পর্যন্ত তাহার নাই। মিনিট-পনেরো এইভাবে কাটিল। আর একটা জিনিস লক্ষ করিতেছিলাম। প্রায় দেখিতেছি, কাছাকাছি এক-একটা জনার, ভুট্টাগাছের ডগা ভয়ানক আন্দোলিত হইয়া 'ছপাৎ' করিয়া শব্দ হইতেছে। একটা প্রায় আমার হাতের কাছেই। সশঙ্কিত হইয়া সেদিকে ইন্দ্রের মনোযোগ আকৃষ্ট করিলাম। ধাড়ি শুয়ার না হইলেও বাচ্চা-টাচ্চা নয় তো?

ইন্দ্র অত্যন্ত সহজভাবে কহিল, ও কিছু না– সাপ জড়িয়ে আছে; তাড়া পেয়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

কিছু না–সাপ! শিহরিয়া নৌকার মাঝখানে জড়োসড়ো হইয়া বসিলাম। অস্ফুটে কহিলাম, কী সাপ ভাই?

ইন্দ্র কহিল, সব রকম আছে, ঢোঁড়া, বোড়া, গোখরো, করেত–জলে ভেসে এসে গাছে জড়িয়ে আছে–কোথাও ডাঙা নেই দেখচিস নে?

সে তো দেখচি। কিন্তু ভয়ে যে পায়ের নখ হইতে মাথার চুল পর্যন্ত আমার কাঁটা দিয়া রহিল। সে লোকটি কিন্তু ভ্রূক্ষেপমাত্র করিল না, নিজের কাজ করিতে করিতে বলিতে লাগিল, কিন্তু কামড়ায় না। ওরা নিজেরাই ভয়ে মরচে—দুটো-তিনটে ত আমার গা ঘেঁষে পালালো। এক-একটা মস্ত বড়ো—সেগুলো বোড়া-টোড়া হবে

বোধহয়। আর কামড়ালেই বা কী করব। মরতে একদিন তো হবেই ভাই! এমনি আরও কত কী সে মৃদু স্বাভাবিক কণ্ঠে বলিতে বলিতে চলিল, আমার কানে কতক পৌঁছিল কতক পৌঁছিল না। আমি নির্বাক-নিস্পন্দ কাঠের মতো আড়ষ্ট হইয়া একস্থানে একভাবে বসিয়া রহিলাম। নিশ্বাস ফেলিতেও যেন ভয় করিতে লাগিল—ছপাৎ করিয়া একটা যদি নৌকার উপরেই পড়ে!

কিন্তু সে যাই হোক, ওই লোকটি কী! দেবতা? পিশাচ? কে ও? কার সঙ্গে এই বনের মধ্যে ঘুরিতেছি? যদি মানুষই হয়, তবে ভয় বলিয়া কোনো বস্তু যে বিশ্বসংসারে আছে, সে কথা কি ও জানেও না! বুকখানা কি পাথর দিয়া তৈরি? সেটা কি আমাদের মত সংকুচিত বিস্ফারিত হয় না? তবে যে সেদিন মাঠের মধ্যে সকলে পলাইয়া গেলে, সে নিতান্ত অপরিচিত আমাকে একাকী নির্বিঘ্নে বাহির করিবার জন্য শত্রুর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল, সে দয়ামায়াও কি ওই পাথরের মধ্যেই নিহিত ছিল! আর আজ? সমস্ত বিপদের বার্তা তন্নতন্ন করিয়া জানিয়া শুনিয়া নিঃশব্দে অকুণ্ঠিতচিত্তে এই ভয়াবহ, অতি ভীষণ মৃত্যুর মুখে নামিয়া দাঁড়াইল, একবার একটা মুখের অনুরোধও করিল না—'শ্রীকান্ত, তুই একবার নেমে যা।' সে তো জোর করিয়াই আমাকে নামাইয়া দিয়া নৌকা টানাইতে পারিত! এ তো শুধু খেলা নয়! জীবন-মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াইয়া এই স্বার্থত্যাগ এই বয়সে কয়টা লোক করিয়াছে! ওই যে বিনা আড়ম্বরে সামান্যভাবে বলিয়াছিল—মরতে একদিন তো হবেই—এমন সত্য কথা বলিতে কয়টা মানুষকে দেখা যায়? সে-ই আমাকে এই বিপদের মধ্যে টানিয়া আনিয়াছে সত্য, কিন্তু সে যাই হোক, তাহার এত বড়ো স্বার্থত্যাগ আমি মানুষের দেহ ধরিয়া ভুলিয়া যাই কেমন করিয়া? কেমন করিয়া ভুলি, যাহার হৃদয়ের ভিতর হইতে এত বড়ো অযাচিত দান এতই সহজে বাহির হইয়া আসিল—সে হৃদয় কী দিয়া কে গড়িয়া দিয়াছিল! তার পরে কতকাল কত সুখ-দুঃখের ভিতর দিয়া আজ এই বার্ধক্যে উপনীত হইয়াছি। কত দেশ, কত প্রান্তর, কত নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত, বন-জঙ্গল ঘাঁটিয়া ফিরিয়াছি, কত প্রকারের মানুষই না এই দুটো চোখে পড়িয়াছে, কিন্তু এত বড়ো মহাপ্রাণ তো আর কখনও দেখিতে পাই নাই! কিন্তু সে আর নাই। অকস্মাৎ একদিন যেন বুদবুদের মতো শূন্যে মিলাইয়া গেল। আজ মনে পড়িয়া এই দুটো শুষ্ক চোখ জলে ভাসিয়া যাইতেছে—কেবল একটা নিস্ফল অভিমান হৃদয়ের তলদেশ আলোড়িত করিয়া উপরের দিকে ফেনাইয়া উঠিতেছে। সৃষ্টিকর্তা! এই অদ্ভুত অপার্থিব বস্তু কেনই বা সৃষ্টি করিয়া পাঠাইয়াছিলে, এবং কেনই বা তাহা এমন ব্যর্থ করিয়া প্রত্যাহার করিলে! বড়ো ব্যথায় আমার এই অসহিষ্ণু মন আজ বারংবার এই প্রশ্নই করিতেছে—ভগবান! টাকাকড়ি, ধন-দৌলত, বিদ্যাবুদ্ধি ঢের তো তোমার অফুরন্ত ভাণ্ডার হইতে দিতেছ দেখিতেছি, কিন্তু এত বড়ো একটা মহাপ্রাণ আজ পর্যন্ত তুমিই বা কয়টা দিতে পারিলে?

(সংক্ষেপিত)

ঠে লা গা ড়ি

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

সবে বিছানা ছেড়ে উঠেছি, রোদ তখনও ভালোরকম ওঠেনি—খিড়কি দোরের জগডুমুর গাছটার মাথায় গোটাকতক শালিখ পাখিতে কিচমিচ ও ঝটাপটি বাধিয়েছে—আমি উঠে মনে মনে তোলাপাড় করছি যে কাল রাত্রের বাসি কলার বড়া যা আমাদের জন্যে রান্নাঘরে ঝুলন্ত শিকায় বড়ো জামবাটিতে টাঙানো আছে—তা কোন অছিলায় মার কাছে চাওয়া যায়, বা মুখ ধোবার পূর্বে তা চাইতে গেলে সেটা শোভনীয়ই বা কতদূর হবে—এমন সময় আমাদের বাহির দরজার কাছে একটা ঠেলাগাড়ির ঘড়ঘড় শব্দ উঠল, সঙ্গে সঙ্গে মিষ্টি রিনরিনে গলায় ডাক শোনা গেল—

—টুনি-ই-ই-দা-আ-আ—ও টুনি.....

অমনি আমার বৃদ্ধা জেঠাইমা মারমুখী হয়ে কী একটা হাতে উঁচিয়ে ছুটে গেলেন—সকালবেলা জুটলে এসে? এখনো কাক-পক্ষীর ঘুম ভাঙেনি, অমনি এলে ছেলেটাকে টুইয়ে বার করে নিয়ে যেতে? সকাল নেই,

সন্ধে নেই, দুপুর নেই, সব সময় ঘড়ঘড় ঘড়ঘড় শব্দ—যাই দিকি একবার হর গাঙ্গুলীর কাছে, বলি, ছেলেটাকে যে দিন নেই রাত নেই গাড়ি ঘড়ঘড় করে বেড়াতে দিচ্ছে, ওর পরকালটা যে ঝরঝরে হয়ে গেল—যা এখন যা, টুনি এখন যাবে না। গাড়ির ঘড়ঘড় সহ্যি হয় না বাপু সব সময়—যা ওসব নিয়ে যা.....

আমি নিরীহ মুখে পূজনীয়া জেঠাইমার পিছনে এসে দাঁড়াতে না দাঁড়াতে গাড়ির শব্দটা আমাদের ঘাটের পথ দিয়ে দূর থেকে দূরে অস্পষ্ট হয়ে গেল, তারপর হাত-মুখ ধুতে গিয়ে খিড়কি দোরের কাছে মৃদু শব্দ কানে এল—ও টুনিদা?.....আমি একবার পিছন ফিরে জেঠাইমার অবস্থিতি-স্থান ও তাঁর দৃষ্টির গতির দিঙ্‌নির্ণয় করে নিয়েই ঝট করে খিড়কি দোরটা খুলে বার হয়ে এলুম। সকালের পদ্মের মতো নির্মল, প্রফুল্ল, তরুণ নরু হাসিভরা ডাগর চোখে দাঁড়িয়ে আছে।

—আসবি নে টুনিদা?

—এই উঠলাম যে, এখনও মুখ ধুইনি, খাবারও খাইনি—বাড়ির মধ্যে আয় না!

নরু চোখের ইশারায় দেখিয়ে দিয়ে বললে—কোথায়?

—কিছু বলবে না জেঠাইমা, আয় তুই.....

উত্থাপিত প্রস্তাবে সে মনেপ্রাণে যোগ দিতে সক্ষম হল না।

—তুই আয় মুখ ধুয়ে টুনিদা—আমি চালতেতলায় আছি গাড়ি নিয়ে, চড়বি তো টুনিদা?

দুজনে মিলে পাড়ায় বেরিয়ে গেলুম। তেঁতুলতলায় খেলার জায়গায় খুব ভিড়—মুখুয্যে পাড়ার কোনো ছেলে আর বাকি নেই। নরু হাসিমুখে বললে—আয় পটুদা, নিতাইদা—আমি গাড়ি এনেছি—দেখ, ঠিক সময়টা আসিনি? আয় চড়...গাড়ি একা নরুই টানতে লাগল।

চড়ল সকলেই। পটু বললে—দুপুরবেলা আমাদের বাড়ি যাবি নরু?

নরু ঘাড় নেড়ে অসম্মতি জানালে।

পটু বললে—যাস তুই—সেদিন যে একেবারে কাকার সামনে গিয়ে পড়েছিলি, তা কি হবে?

নরু বললে—আমি আর যাচ্ছিনে তোমাদের বাড়ি পটুদা। তোমার কাকা সেদিন একেবারে মারতে.....বললে রোজ রোজ গাড়ি ঠেলে বেড়ানো বার করছি। আমি না পালালে সেদিন মার খেতুম ঠিক। যদি এরপর গাড়ি কেড়ে রাখে?

সেখান থেকে দুজনে গিয়ে পথের ধারে বড়ো জামতলার ছায়ায় বসে গল্প করলুম। রোজই কত গল্প হত। এরপরে কে কী হবে তাই নিয়ে গল্প।

খোকার অত ভবিষ্যৎ ভেবে দেখবার বয়স হয়নি! সে এর পরে কী হবে অত গুছিয়ে বলতে পারে না—খাপছাড়া ভাবে উত্তর দেয়, বলে—সে নৌকোর মাঝির সর্দার হবে, রেলগাড়ির ইঞ্জিন চালাবে, ইস্টিমার যারা চালায়, তাদের কী বলে—তাও হতে চায়। আমি আমার সমবয়সী ছেলেদের তুলনায় একটু অকালপক্ক, বললাম—আমি ভাই সায়েব ডাক্তার হব। মহকুমার হাকিম হব।.....

অনেক বেলায় সে রৌদ্রে ঘুরে রাঙামুখে বাড়ি ফিরত। বাবা যেদিকে বসে, সেদিকে না গিয়ে চুপি চুপি অন্য দিক দিয়ে বাড়ি ঢোকে। মা বলত—ওরে দুষ্টু, তুমি সেই বেরিয়েছ কোন সকালে, আর এই দুপুর ঘুরে গেল, এখন তুমি.....

খোকা বলে—চুপ চুপ—না, আমি তো ওই ওদের বাড়ির জামতলায় চুপটি করে বসে বসে খেলা কচ্ছিলাম, আমি আর টুনিদা—কোথাও তো যাইনি মা! সত্যি.....

কি জানি কেন ওকে বড়ো ভালোবাসতুম। গ্রামের সকল ছেলের চেয়ে এর মুখে-চোখে, কথায় কী মোহ যে ছিল—সারাদিনটির মধ্যে একবার অন্তত ওর সঙ্গে না দেখা করে পারতুম না। খোকাও আমার বাড়ি না হয়ে পাড়ার অন্য কোথাও বেরুত না।

এক-একদিন আমাদের বাড়ির সামনের জামতলা দিয়ে সে গাড়ি ঠেলে নিয়ে বাড়ি ফিরে যায় দুপুরের আগে। আমার দিকে চেয়ে বলে—এমন দুষ্টু এই নিতাইটা, এত করে বললুম, চড় গাড়িতে, আয় তোকে ঠেলে গয়লাপাড়া ঘুরিয়ে আনি...তা কিছুতে চড়লো না, বললে, মা বকবে, তেল আনতে যাচ্ছি—আয় চড়বি টুনিদা?

—আমাদের পাড়ায় কেউ চড়লে না, কখন থেকে ঘুরে বেড়াচ্ছি—সব যা দুষ্টু। আসবি টুনিদা?

খোকার চোখের মিনতি-ভরা দৃষ্টি তখনকার দিনে আমার এড়াবার সাধ্য হত না কোনোমতেই। আমি চড়তুম। মহা খুশির সঙ্গে খোকা চৈত্র-বৈশাখের মধ্যাহ্ন সূর্যকে উপেক্ষা ও অবজ্ঞা করে গাড়ি ঠেলে বেড়াত.....সূর্যও প্রতিশোধ নিতে গিয়ে ওর কচি মুখ রাঙিয়ে দিতেন, ঘামে কাপড় ভিজিয়ে দিয়ে ছাড়তেন।

তার বয়স অল্প ও দেহ অত্যন্ত ক্ষীণ ছিল বলে পাড়ার কোনো ছেলের সঙ্গে বলে সে পেরে উঠত না.....সকলের কাছে তাকে অবিচার সহ্য করতে হত। দুর্বলের প্রতি সবলের অধিকার তার ওপর নির্বিবাদে জারি করত সকলেই।

সেদিনটা ছিল ভারি গরম। চৈত্র-বৈশাখের দিন গ্রামের পথের ধুলো তেতে আগুন হয়েছে—পঞ্চাননতলায় বারোয়ারীর আসর সাজানো, বাঁশের মাচা বাঁধা—সবাই কাজে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত খাটছে।

বড়ো পিটুলি গাছতলাটায় তার ঠেলাগাড়ির ঘড়ঘড় আওয়াজ উঠল। অনু বললে—ওই নরু আসছে। পিছনে পরমসঙ্গী কেরোসিনের ঠেলাগাড়িটা টেনে নরু হাজির। বাঁধা আসরের দিকে এসে আঙুল দেখিয়ে বলে—যাত্রা কবে বসবে রে টুনিদা?

সংবাদ সংগ্রহের পর সে সন্তোষের হাসি হাসল। আঙুল দিয়ে গাড়িটার দিকে দেখিয়ে বললে—চড়বি পটুদা? পটু ঘাড় নেড়ে বললে—চড়ব, টানবে কে?

খোকা খুব খুশি হয়ে বললে—কেন আমি?

আসন্ন আমোদের প্রত্যাশায় তার চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

পটু বললে, দূর, তুই বুঝি আমায় টানতে পারিস? টান দিকি কেমন—হয় না আর আমাকে......

—বসো না? টানতে কেমন পারিনে!

পটুর পালা শেষ হয়ে গেলে ক্রমে ক্রমে অনু, বরু, হরু উপস্থিত সব ছেলেই উঠল গাড়িতে। এদের মধ্যে বড়ো-ছোটো সবরকমই আছে, টানতে টানতে খোকা হয়রান হয়ে পড়লেও সে উৎসাহের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত ঠিক টেনে নিয়ে বেড়াল সকলকে। সকলের শেষ হয়ে গেলে সে হেসে সকলের মুখের দিকে চেয়ে বললে—আমায় একটু এইবার টান!

সকলে মুখ চাওয়া-চাওয়ি শুরু করলে। ভাবে বোঝা গেল, তাকে কেউ টানতে রাজি নয়। তার প্রতি কৃপা করে তার গাড়িতে চড়ে তাকে দিয়ে টানিয়ে তাকে কৃতার্থ করা হয়েছে, এতে আবার তার পরকে দিয়ে টানাবার কোন দাবি আছে? সকলে মিলে এই ভাবটা দেখালে।

—বাঃ, সকলকে চড়িয়ে দিলাম, আর আমার বেলায় বুঝি কেউ.....

আমার ইচ্ছে হল তাকে গাড়িতে চড়িয়ে টানি। কিন্তু সমবয়সী ছেলেদের কাছে উপহাসের ভয়েই হোক বা তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার সাহস না থাকার দরুনই হোক—যেতে পারলুম না। সে গাড়ি টেনে নিয়ে চলে গেল। এদের মধ্যে পূর্বে কী পরামর্শ হয়েছিল আমার জানা নেই—গাড়িখানা খানিক দূর যেতে না যেতেই দলের একজন একটা বড়ো ঝামা ইট নিয়ে গাড়িতে ছুড়ে মেরে বসল।

গাড়িখানার তলা তখনি মচমচ করে দেশলাইয়ের বাক্সের মতো ভেঙে গেল। খোকা পিছন ফিরে চেয়ে দেখে কেমন অবাক হয়ে গেল—পরে তাড়াতাড়ি গাড়ির ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয় করবার জন্যে এসে গাড়ির অবস্থা দেখেই আর একবার বিস্ময়ের দৃষ্টিতে আমাদের দিকে চাইলে। তারপর সে চাইলে আমার দিকে—তার চোখের সে ব্যথা-ভরা বিস্ময়ের অপ্রত্যাশিত না-বুঝতে পারা দৃষ্টি আমার বুকে তীরের মতো বিঁধল। ভাবল এই রকম যে, তুইও টুনিদা এর মধ্যে?

কিন্তু সে কোনো কথা কাউকে না বলে ভাঙা গাড়িটার পাশে বসে পড়ে দেখতে লাগল। এর আগেই আমাদের দল সেখান থেকে সরে পড়েছিল।

তারপর অনেকক্ষণ সে বসে বসে নেড়েচেড়ে দেখলে গাড়িখানার ভাঙা তলাটা কি করে সারানো যায়। পাশে একটা ছোটো বাক্স ফুলের গাছের সাদা ডালে থোলো থোলো বাক্স ফুল দুলছিল—তাই পাশে গাব-ভেরেন্ডার ঝোপের ধারে সে গাড়িখানা রেখে খানিক বসে বসে পরে ঠেলে নিয়ে গেল।

সারারাত ভালো ঘুম হল না। সকালে ওদের বাড়ি ছুটে গিয়ে যদি ভাব করে ফেলতুম তো বেশ হত, কিন্তু কেমন বাধো বাধো ঠেকতে লাগল। খোকা রোজ সকালে আসে, সেদিন এল না, অভিমানে ভুল বুঝেছে।

দু-তিন দিন করে সপ্তাহখানেক কেটে গেল।

অল্পদিন পরেই আমি বাড়ির সকলের সঙ্গে মামার বাড়ি চলে গেলুম ছোটো মাসিমার বিয়েতে। ফিরতে হয়ে গেল আট-দশ মাস।

খোকাকে ফিরে এসে আর দেখিনি। আগের পৌষ মাসে সে হুপিংকাশিতে মারা গিয়েছে। ফেরবার দিন দশেক পরে একদিন ওদের বাড়ি গিয়েছিলুম। খোকার মা উঠানে কুল রৌদ্রে দিয়েছিল, তখন তুলছে, আমায় দেখে বললে—টুনি, তোরা দেশে এলি?.....আমি কোনো কথা বলবার আগেই তার মা হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল—তবুও এসেছিস তুই টুনি—আর কি কেউ আসবে এ বাড়িতে? খোকা যে আমায় ফাঁকি দিয়ে চলে গিয়েছে রে! বোস বোস, বাতাবি নেবু পাকা ঘরে আছে, কেটে দেব, খাবি নুন দিয়ে? ওই পেকে পেকে থাকে, কেউ খায় না—খোকা কত খেত—খা না বসে বসে।

শরতের অপরাহ্ন। নির্মেঘ নীল আকাশের তলায় অবসন্ন বৈকালের রৌদ্রে ডানা মেলে কী পাখি উড়ে চলেছে। কার্নিস ভাঙা ছাদের ফাটলে কোথায় ঘুঘুর ডাক.....উঠানের ছায়াস্নিগ্ধ বাতাস শুকনো কুলের গন্ধে ভরপুর।

খোকার সেই ঠেলাগাড়িখানা দেখলুম—কাঠের মাচার নীচে তোলা আছে। দড়িটা পর্যন্ত। অনেকদিন গাড়িটাতে কেউ হাতও দেয়নি।

বহুকালের কথা হলেও আমি কিন্তু চোখ বুজে ভাবলেই দেখতে পাই—কতকাল আগেকার আট বৎসরের সেই ছোট্ট খোকাটি ঠেলাগাড়িটা টেনে নিয়ে বেড়াচ্ছে। নির্জন দুপুর ঘুঘুর ডাকের মধ্যে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পালেদের জামরুল বাগানের ছায়ায়.....আমাদের বড়ো মাদার গাছটার তলাকার পথ দিয়ে, রাঙা মুখে আশা ও আনন্দ-ভরা উজ্জ্বল চোখে সে তার কেরোসিন কাঠের গাড়িখানা টেনে টেনে নিয়ে আসছে.....নারিকেলতলা বেয়ে.....পটুদের বড়ো দো-ফলা আম গাছটার তলা বেয়ে.....যেতে যেতে ক্রমে তার মূর্তি মাইতি-পুকুরের মোড়ের পথে সুপারি গাছের সারির আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যায়।

সভাকবি

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

এক যে ছিল রাজা!

রাজার মস্ত বড়ো রাজত্ব। যেমন নাম তার তেমনি প্রতিপত্তি।

রাজার কাজ নেই, কর্ম নেই, সারাটা দিন শুধু বসে বসে খায় আর ঘুমোয়। দিন তার যেন কিছুতেই কাটতে চায় না।

কি আর করে, মানুষের একটা নেশা তো চাই! অনেক ভেবেচিন্তে রাজা এক ভারি মজার নেশা ধরলে। —কবিতা লেখার নেশা।

দিনে বিশ্রাম নেই, রাত্রে ঘুম নেই, দিনরাত শুধু দেখা যায়—সাদা কাগজের ওপর খসখস করে রাজা-বাহাদুর কলম চালাচ্ছে আর কবিতা লিখছে।

কিন্তু কবিতা লেখা বড়ো সহজ কথা নয়। মিলের পর মিল ভেবে ভেবে রাজার মাথা গেল খারাপ হয়ে। দিনরাত কেমন যেন উন্মনা ভাব, ডাকলে সাড়া দেয় না, ভালো করে কথা বলে না।

রানি একদিন জিজ্ঞাসা করলে : কী করো ও-সব?

রাজা বললে : কবিতা লিখি।

রানি বললে : কই শুনি কেমন তোমার কবিতা!

রাজা একটি একটি করে কবিতা পড়ে আর রানির মুখের পানে তাকায়।

রানি বলে : চমৎকার!

রাজার খুশির আর সীমা নেই।

পাঁচ নম্বর কবিতাটি ছিল একটুখানি বড়ো। রাজা সেটি পড়ে শেষ করে রানির মুখের পানে তাকাতেই দেখে—রানি ঘুমিয়ে পড়েছে।

রাজা একটুখানি হাসলে। হেসে কবিতার খাতাটি দিলে বন্ধ করে।

রাজা বোকা ছিল না। বুদ্ধি ছিল তার অসাধারণ।

কবিতার খাতা সেই যে সে বন্ধ করলে, একটি দিনের তরেও সেটি আর তাকে খুলতে দেখা গেল না।

পাত্র, মিত্র, সভাসদ—সবাই অবাক!

মন্ত্রী জিজ্ঞাসা করলে : কবিতার নেশা কি আপনার কেটে গেল রাজা?

রাজা বললেন : হ্যাঁ। কবিতার নেশা বড়ো সাংঘাতিক নেশা মন্ত্রী। এ নেশা সকলের ধাতে সহ্য হয় না।

তারপর হঠাৎ একদিন রাজার মাথায় কী খেয়াল চাপল, মন্ত্রীকে ডেকে বললে : 'রাজ্যে প্রচার করে দিন—যে লোক সবচেয়ে ভালো কবিতা লিখতে পারবে, তাকে আমি আমার সভাকবি করব।'

সংবাদটা যেই প্রচারিত হওয়া,—বাস্, তার পরের দিন থেকে গাদা গাদা কবিতা আসতে লাগল রাজার দরবারে। কবি আর কবিতার দায়ে মন্ত্রীর অবস্থা হলো ঠিক পাগলের মতো।

মন্ত্রী রাজাকে গিয়ে বললে : কবিতার আমি কিছু বুঝি না রাজা। বিচারের ভার আপনি গ্রহণ করুন।

রাজা এতদিন পরে আবার একটা কাজের মতো কাজ পেল। পর্বতপ্রমাণ কবিতার স্তূপ একটি একটি করে পড়তে লাগল।

তিন মাস লাগল তার কবিতাগুলি পড়ে শেষ করতে।

অধিকাংশই বাজে। মাত্র পঁচিশটি কবিতা মনে হলো যেন কবিতার নেশায় মশগুল হয়ে লেখা। এই পঁচিশজন কবিকে ডেকে পাঠানো হলো।

আনন্দে আত্মহারা হয়ে এই পঁচিশজন কবি রাজার দরবারে এসে হাজির।

সকলেই এল রাজার সভাকবি হবার আশায়।

কিন্তু রাজার বিচার শুনে তাদের চক্ষুস্থির!

কাজ নেই বাবা সভাকবি হয়ে! তারা তখন পালাতে পারলে বাঁচে।

রাজার হুকুমে রাজবাড়ির সদর ফটক গেল বন্ধ হয়ে। প্রহরীরা তাদের যেতে দিলে না।

রাজা বললে : এই পঁচিশজন কবিকে কয়েদখানায় বন্ধ করে রাখো। দিনে মাত্র একবার করে খেতে দাও, আর প্রত্যেককে বলে দাও কবিতা যেন তারা না লেখে।

রাজার আদেশ।

কী আর করবে। সেইদিন থেকে এই দুর্ভাগা পঁচিশজন কবি নিরতিশয় নির্যাতন সহ্য করে কয়েদখানায় বন্দি হয়ে রইলো।

একমাস পরে রাজা নিজে গেল তাদের দেখতে। দেখলে, তাদের দুর্দশার একশেষ! অনাহারে অনিদ্রায় আর দুর্ভাবনায় প্রত্যেকের শরীর হয়েছে শীর্ণ কঙ্কালসার। দেখলে আর সহজে চিনতে পর্যন্ত পারা যায় না।

অনুসন্ধান করে দেখা গেল, পঁচিশজন কবির মধ্যে মাত্র তিনজন রাজার আদেশ অমান্য করে লুকিয়ে লুকিয়ে কবিতা লিখেছে।

ধরা যারা পড়ল তারা তো ভেবেই অস্থির! আবার কী শাস্তি হয় কে জানে?

এই তিনজন কবিকে রাজা বললে ধরে রাখো, বাকি বাইশজনকে দাও ছেড়ে।

বাইশজন কবি ছাড়া পেয়ে যেন বেঁচে গেল! বাড়ি গিয়ে কিন্তু দেখে, রাজা অবিচার করেনি, তাদের বাড়িতে রীতিমতো টাকা পাঠিয়ে দিয়েছে।

এদিকে যে তিনজন কবিকে ধরে রাখা হয়েছে, রাজা বললে, ডাকো তাদের!

রাজা এই তিনজনকে ডেকে তিনখানি বাড়ি দিলে—প্রচুর অর্থ দিলে, বললে—দেশ থেকে স্ত্রী-পুত্র এনে পরম আনন্দে তোমরা এইখানে বাস করো।

কিন্তু একটি কথা—

কবিতা আর তোমরা লিখতে পাবে না!

তাদের পশ্চাতে রইল রাজার গুপ্তচর। কবিতা লিখলে শাস্তি তাদের অনিবার্য।

আর কেনই বা কবিতা লিখবে? প্রচুর ঐশ্বর্য লাভ করে নিশ্চিন্ত নির্ভাবনায় স্ত্রী-পুত্র-পরিবার নিয়ে যারা বাস করছে, অন্তরের এ ক্ষণিক বিলাসে তাদের কিই-বা প্রয়োজন!

কবিতা লেখা বোধহয় তারা ছেড়েই দিলে।

কিন্তু কী আশ্চর্য ব্যাপার, এই তিনজনের মধ্যে একজন হঠাৎ একদিন ধরা পড়ল। নিতান্ত সংগোপনে সে নাকি আবার কবিতা লিখেছে।

গুপ্তচর নিয়ে এল তাকে রাজার কাছে ধরে।

রাজা জিজ্ঞাসা করলে : লুকিয়ে লুকিয়ে আপনি কবিতা লিখেছেন?

কবি বললে : হাঁ রাজা। আপনার দেওয়া ঐশ্বর্য আপনি ফিরিয়ে নিন। কবিতা না লিখতে পেলে আমি মরে যাব।

রাজার মুখে হাসি ফুটল। বললে : ডাকো মন্ত্রীকে!

মন্ত্রী এল।

রাজা বললে : এতদিন পরে আমার কবিতার বিচার শেষ হল মন্ত্রী। ইনিই আমার সভাকবি।

কবি জিজ্ঞাসা করলে : আমাকে কী করতে হবে রাজা?

রাজা বললে : মনের আনন্দে আজ থেকে আপনি কবিতা লিখবেন।

চিল্কা

সৈয়দ মুজতবা আলী

সন্ধ্যাবেলা গোলাপের কুঁড়িটির দিকে অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে রইলুম। প্রকৃতি যেন যুগ যুগ ধরে কোটি কোটি কুঁড়ি তৈরি করার পর আজ এ-কুঁড়িতে তার পরিপূর্ণতা পেয়েছে।

সকালবেলা বাগানে গিয়ে দেখি, সে-কুঁড়িটি ফুটেছে। কুঁড়ির ভিতরে প্রকৃতি গোপনে গোপনে পাপড়ির যে নিখুঁত সামঞ্জস্য সাজিয়ে রেখেছিল সেই সামঞ্জস্য নিয়েই পাপড়িগুলো বাতাসের গায়ে শরীর মেলে দিয়েছে। রেণু যেন রাজকুমারী, আর চতুর্দিকে সার বেঁধে তাঁর সখীরা এক নিস্তব্ধ নৃত্য আরম্ভ করে দিয়েছেন।

চুপ করে দেখতে দেখতে আমার মনে হল, সন্ধ্যাবেলার কুঁড়িতে দেখছিলুম এক সৌন্দর্য আর সকালবেলার ফোটা-ফুলে দেখছি আরেক সৌন্দর্য। এই পরিবর্তনটি যদি আমার চোখের সামনে ঘটত তবে এই দুই সৌন্দর্যের ভিতর আরও কত সৌন্দর্য দেখতে পেতুম। কিন্তু সে তো হবার নয়; ফুল ফোটে এত ধীরে ধীরে যে তার বিকাশ আর পরিবর্তন তো চোখে পড়ে না। সমস্ত রাত কুঁড়ির কাছে জেগে রইলেও সৌন্দর্যের ক্রমবিকাশে তার ভিন্ন ভিন্ন রূপ আমার চোখ এড়িয়ে যাবে।

ভগবান আমার সে-ক্ষোভ চিল্কার পারে ঘুচিয়ে দিলেন।

অতি ভোরে চিল্কার সার্কিট-হাউসে ঘুম ভাঙল, বারান্দায় কাচ্চাবাচ্চাদের কিচিরমিচির শুনে। আঙ্গুল-আশ্রমের ছেলেমেয়েগুলো তা হলে নিশ্চয়ই দুপুর-রাতে এসে পৌঁছেছে।

দরজা খুলে পুব আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখি, আমার বাগানের সেই গোলাপ-কুঁড়ি। শুধু এ-কুঁড়ির রং একটু বেশি লালচে। আমার আর পুব আকাশের মাঝখানে বিস্তীর্ণ জলরাশির উপর এক ফালি সিঁথির সিঁদুর। কিংবা যেন কোনো রক্তাম্বরধারিণী গরবিনী চিল্কার উপর দিয়ে পুব সাগরের পানে যেতে যেতে রক্তাম্বরী নিংড়ে নিংড়ে জল ফেলে ফেলে আমার ওই কুঁড়ির পিছনে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছেন।

সুন্দরীর কথা ভুলে গিয়ে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলুম কুঁড়ির দিকে। সে-কুঁড়ি ফুটতে আরম্ভ করেছে। শুধু এর পাপড়ির আকার অন্য রকমের। সোজা, ধারালো তলোয়ারের মতো এক-একটি সূর্যরশ্মি দিগ্‌বলয়ের অন্তরাল থেকে হঠাৎ পূর্ব গগন পানে ধেয়ে ওঠে। অসংখ্য রশ্মি অর্ধচক্রাকারে আকাশ ছেয়ে ফেলেছে। তাদের কেন্দ্র-ঘুমন্ত রাজকুমারীর এখনও দেখা নেই। আকাশের লাল ক্রমেই কমে আসতে লাগল। চিল্কার রাঙা জলের ফালি গোলাপি হয়ে হয়ে শেষটায় নীলাম্বরী পরতে আরম্ভ করেছে।

চতুর্দিকে আর সব কিছু পাণ্ডু, যেন হিমানীর গ্লানি-মাখা।

সবিতা স্বপ্রকাশ হলেন। আলোতে আলোতে হিমানীর সর্ব-গ্লানি ঘুচে যাচ্ছে। পুব-আকাশের দিকে ধেয়ে-ওঠা সূর্য-অসিরাজি সবিতা সংহরণ করে নিয়েছেন। জাদুকর তার ভানুমতীর ইন্দ্রজাল অদৃশ্য করে পূর্ণ মহিমায় রঙ্গমঞ্চে একা দাঁড়িয়ে রইলেন।

আমারই চোখের সামনে আমার বাগানের গোলাপের কুঁড়িটি ফুটে উঠল। এর সম্পূর্ণ ফোটাটি আমি প্রাণভরে দেখলুম। এর কিছুই ফাঁকি গেল না। কিন্তু এ-ফোটা গোলাপের ফোটার চেয়ে কত লক্ষ গুণে গম্ভীর। এর ব্যাপ্তি বিশ্ব-চরাচর ছড়িয়ে এবং হয়ত ছাড়িয়ে।

আমার মনে আর কোনো ক্ষোভ রইল না।

আলো ফুটেছে, কিন্তু জলে বাতাসে, ডাঙায় আকাশে এখনও যেন কী এক আবেশ জড়ানো। চিল্কার জল কেমন যেন একটা নীলফুরি রং মেখে নিয়েছে। এ-রং সমুদ্রের জল চেনে না, দেশের বিলে, বিদেশের ব্লু ডানয়ুবেও নীলের এ আভাস আমি কখনও দেখিনি। তবে কি চিল্কা একদিকে যেমন হ্রদ, অন্যদিকে তেমনি সমুদ্রের সঙ্গে জোড়া বলে সাদায় আর নীলে মিশে গিয়ে নীলফুরি রং ধরেছে? তাই হবে। বর্ষায় নাকি নদীর অপর্যাপ্ত জল হ্রদে নেমে এসে তার লোনা জলকে মিঠা করে দেয়। শীতে নাকি সমুদ্রের জোয়ারের মারে জল ফের লোনা হয়ে যায়।

নীলফুরির মাঝখানে ওই বিরাট কালো পোঁচ কীসের? মন্দমধুর ঠান্ডা হাওয়া বইছে বলে সে পোঁচ আবার অল্প অল্প দুলছে। স্টিমলঞ্চ ক্রমেই কালো পোঁচের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ দেখি সেই কালো ফালিটা জল ছেড়ে আকাশের দিকে হাওয়ায় ভর করে উড়ে চলল—লক্ষ লক্ষ পাখি। এরা নাকি এসেছে সাইবেরিয়া থেকে, হিমালয় থেকে। ঠিকই তো; এদেরই তো আমি দেখেছি খাসিয়া পাহাড়ের পায়ের কাছে, ডাউকির হাওরে হাওরে, চেরাপুঞ্জির জলে ভর্তি বিলে বিলে।

চিল্কার সমস্ত সৌন্দর্য এক মুহূর্তে অন্ধকার হয়ে গেল। হৃৎপিণ্ডটা কে যেন শক্ত হাতে মুচড়ে দিল, বুক থেকে কী যেন একটা উঠে এসে গলাটাকে বন্ধ করে দিল। আর যেন ঢোক গিলতে পারছি নে।

মাথার উপরকার আকাশ ছেয়ে ফেলে শুভ্র মল্লিকার পাপড়ি ছড়ালে কে? পাপড়িগুলো অতি ধীরে ধীরে কেঁপে কেঁপে, এদিক ওদিক হয়ে হয়ে জলের দিকে নেমে আসছে। বিলেতের বরফ-বর্ষণ এর কাছে হার মানে।

এ তো সেই পাখিগুলোর বুক। এদের পিঠের রং কালো। তাই তারা যখন জলে বসে থাকে তখন মনে হয়, এরা হ্রদের নীল চোখের কৃষ্ণাঞ্জন, আর আকাশ থেকে যখন নেমে আসে তখন উপরের দিকে তাকিয়ে দেখি সিত-মল্লিকা-বর্ষণ।

পাশে ভাগনি কৃষ্ণা বসে ছিল। বললে, 'মামা, ওই দেখো, চিল্কার দেবী কালীমার দ্বীপ। ওখানে জল নেই, ঘাস নেই, তোমার টাকের মত সব কিছু খা-খা করছে।'

টাকের কথা ওঠাতে বিরক্ত হয়ে দ্বীপের দিকে না তাকিয়ে তাকালুম রোষ-কষায়িত লোচনে, কৃষ্ণার চোখের দিকে। সেখানে দেখি চিল্কার মাধুরী। কৃষ্ণার চোখের সাদা যেন সাদা হতে হতে নীলফুরি হয়ে গিয়েছে আর তার গায়ের কালো রঙ দিয়ে চোখের চতুর্দিকে স্বয়ং বিশ্বকর্মা এঁকে দিয়েছেন কৃষ্ণাঞ্জন।

ভগবান একই সৌন্দর্য কত না ভিন্ন ভিন্ন রূপে দেখান! শিশুর খলখলে হাসি আমি শুনেছি নির্ঝরিণীর কলকল রোলে, বিগলিত মাতৃস্তন্য দেখেছি আরবের মরুভূমির বুক ফেটে বেরিয়ে আসা সুধারসে, নবজাত শিশুর গাত্রগন্ধে পেয়েছি প্রথম আষাঢ়ের ভিজে মাটির গন্ধ।

রসময় পাঠক, এইবারে আমি তোমার একটু করুণা ভিক্ষা করি। আমি কাব্যরস ভিন্ন অন্য আরও দু-একটি রসের সন্ধান করি। তারই একটি খাদ্যরস। চিল্কার এ-পাখির রস আমি চেখেছি দেশে। আবার লোভ হল। সঙ্গে ছিল স-বন্দুক পারিকুদের রাজা। তার এবং তার বন্দুকের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালুম। সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে চিল্কার কালীকে স্মরণ করে বললুম, 'গোটা পাঁচেক পাখি দাও না, মা!' তারপর ভাবলুম, না, অত বেশি চাওয়া-চাওয়ি ভাল নয়, দেবীকে দেখাতে হবে, আমি কত অল্পেতেই সন্তুষ্ট হই। মনে মনে বললুম, 'আচ্ছা, না হয়, পাঁচটা না-ই বা দিলে। গোটা দুত্তিন দিলেই হবে। আমার খাঁই মাইজী বড্ডই কম।'

বলেই একটা ইরানি গল্প মনে পড়ে যাওয়াতে হাসি পেল। এক ইরানি দরবেশ ভগবানকে উদ্দেশ করে বললে, 'হে আল্লাতালা, আমাকে হাজার পঁচিশের তুমান দাও। আমি তোমার কিরে কেটে বলছি, তার থেকে পাঁচ হাজার তুমান গরিব-দুঃখীদের ভিতর দান-খয়রাত করে বিলোব। আমাকে বিশ্বাস করতে পারছ না? আচ্ছা, তা হলে তোমার পাঁচ হাজার তুমান কেটে নিয়ে আমাকে বিশ হাজারই দাও।'

চিল্কা হ্রদ বিস্তর ছোটো ছোটো দ্বীপে ভর্তি। মাত্র একটি ছাড়া নাকি সব কটাতেই মিষ্টি জল পাওয়া যায়। এসব দ্বীপে থাকে গরিব জেলেরা। ডাঙার সঙ্গে এদের কোনো যোগসূত্র নেই। এদের পোস্টঅফিস নেই, টেলিগ্রাফের তার ডাঙার সঙ্গে দ্বীপের মানুষকে কাছাকাছি এনে দেয়নি। আর আপন দ্বীপের বাইরে বিশ্বসংসারের কাকেই বা এরা চেনে যে ওরা এদের টেলিগ্রাম পাঠাবে, ওরা এদের কুশল সংবাদ জানতে চাইবে।

আমি ভাবলুম, আমার দেশে নাগা-গারোরা পর্যন্ত মাঝে মাঝে পাহাড় থেকে নেমে, পায়ে হেঁটে কিংবা বাসে করে শহরে যায়। এটা সেটা দেখে, ফুটপাতের দোকানে বসে চা খায়, সিনেমা যায়, কেনাকাটাও করে। এই উড়িষ্যারই আদিবাসীরা মাঝে মাঝে বন থেকে বেরিয়ে এসে আমাদের বাড়িঘরদোর দেখে, হয়ত মনে মনে সংকল্প করে, বনের ভিতরই ওদের জীবনকে আরও সমৃদ্ধ করবে। কিন্তু চিল্কার দ্বীপবাসীরা সৃষ্টির সেই আদিমকাল থেকেই দ্বীপবাসী। আজ যেসব জিনিসপত্র দিয়ে তারা মাছ ধরে, দু-হাজার বৎসর পূর্বেই তাই দিয়ে তারা মাছ ধরেছে। সভ্যতার শ্রীবৃদ্ধি, বিজ্ঞানের প্রসার এদের কোনো কাজে লাগেনি।

হয়ত ভালোই আছে। ফারসিতে বলে, 'দূর বাশ্‌, খুশ বাশ্‌।' দূরে আছে, ভালোই আছে। টমাস কেম্পিসও বলেছেন, 'যতবার আমি মানবসমাজে গিয়েছি ততবারই আমি খানিকটে মনুষ্যত্ব হারিয়ে বাড়ি ফিরেছি।' হয়ত 'সভ্যতা'র আওতায় না এসে এরা সত্যই সভ্যতর।

চিল্কার বড়ো দ্বীপ পারিকুদ। ডাঙা থেকে মাইল আষ্টেক দূরে হবে। দ্বীপে নেমে খানিকক্ষণ চলার পর মনে হল, কোথায় চিল্কা, কোথায় তার নীলফুরি জল, কোথায় দূর-দূরান্তের সিন্ধু-রেখা আর কোথায়ই বা কৃষ্ণপক্ষ পক্ষীর শুভ্র বক্ষের মল্লিকা বর্ষণ। এ ত দেখছি, পুব-বাংলার পাড়া গাঁ। রাস্তার উপর সাদা ধুলো। দু-দিকে রাস্তার জন্য মাটি তোলার ফলে লাইন বেঁধে ডোবার সারি। তাতে ফুটেছে ছোটো ছোটো শ্বেতপদ্ম রক্তপদ্ম। মাছরাঙা ওড়াওড়ি করছে আর মাঝে মাঝে এক-পায়ে দাঁড়িয়ে ধ্যানমগ্ন বক। মোষগুলো গলা অবধি জলে ডুবিয়ে চোখ বন্ধ করে ধীরে গম্ভীরে মাথা নাড়ছে। শুধু পুব-বাংলার জমির মতো এ জমি উর্বরা নয়; তাই খেতখামারের চিহ্ন কম।

রোদ চড়ছে। দূর গ্রামের শ্যামশ্রীর দিকে তাকিয়ে চোখ জুড়োয়। ওইখানে পৌঁছতে পারলে হয়। শহরের লোক; এতখানি হেঁটে অভ্যেস নেই। ক্লান্তি বোধ হচ্ছে।

সঙ্গে পরিকুদের রাজা। রাজবাড়িতে পৌঁছে দু-দণ্ড জিরিয়ে নিলুম। সেখানে বিরাট বিরাট কৌচ সোফা। দশ-হাতী খাড়া আয়না, জগদ্দল কাবার্ড আলমারি, সোনার সিংহাসন, মার্বেল-টপ টেবিল, বাথ-টাব, ঝাড়-ফানুস, আরও কত কী! এসব ওই গরিব জেলেদের পয়সায়? অবিশ্বাস্য।

কলকাতা থেকে ট্রেনে এসেছে চিল্কার পার অবধি। তারপর কত চেল্লাচেল্লি হৈ-হুল্লোড়ের ভিতর এগুলোকে নৌকায় চাপানো হয়েছে, নাবাতে হয়েছে, কত লোক মাথার ঘাম পায়ে ফেলে এগুলোকে রাজবাড়ি পর্যন্ত কাঁধে করে বয়ে এনেছে, পড়ি-মরি হয়ে উপরের তলায় তুলেছে।

শুধু রাজপরিবার এগুলো ব্যবহার করেন। রাজপরিবার বলতে উপস্থিত রাজা আর রানি। আর আজ সকালের মতো আমরা।

সূর্য মধ্যগগনে। লঞ্চ পুবদিকে সমুদ্রের পানে ধাওয়া করেছে, যেখানে হ্রদের সঙ্গে সমুদ্রের সঙ্গম।

পূর্বদিগন্তে যেখানে সমুদ্র আর হ্রদ আকাশের সঙ্গে মিশেছে সে-জায়গা ঝাপসা হয়ে আছে। মনে হয়, হ্রদ দূরে যেতে যেতে হঠাৎ যেন কোথাও অসীম শূন্যে লীন হয়ে গিয়েছে। গ্রীষ্মের দ্বিপ্রহরে গরমের দেশের দগ্ধতাম্র দিগন্তে যে আস্বচ্ছ ছায়ানৃত্য আরম্ভ হয়, এখানে যেন তারই এক অন্যরূপ। এখানে যেন অশরীরী বাষ্প-নৃত্য আরম্ভ হয়েছে আর তারই আড়ালে হ্রদের শেষ, সমুদ্রের আরম্ভ, সমুদ্রবক্ষে আকাশের চুম্বনে সব কিছু ঢাকা পড়ে গিয়েছে।

তাই পশ্চিমমুখো হয়ে বসলুম ডাঙার দিকে তাকিয়ে।

পাখিরা সব গেল কোথায়? শুধু দু-একটি ঝাঁক হেথা হোথায়। বোধ হয় ঠান্ডা দেশের প্রাণী বলে দ্বীপের গাছতলার ঠান্ডাতে আশ্রয় নিয়েছে।

কত রকমের নীল রং দেখছি।

হ্রদের জল দুপুর-রোদে অতি হালকা ফিকে নীল হয়ে গিয়েছে। হ্রদের পরে পাড়ের গ্রামের রং এমনিতে ঘন সবুজ, কিন্তু এখন দেখাচ্ছে হ্রদের জলের চেয়ে একটুখানি ঘনতর নীল। গ্রামের পিছনে পাহাড়, তার রং আরও একটু বেশি ঘন নীল। এবং সর্বশেষে পাহাড়ের পিছনের আকাশ ঘোর নীল।

এ কী করে সম্ভব হয় জানিনে। গ্রামের গাছপালা, পাহাড়ের ঝোপ-ঝাড় হয় সবুজ রঙের কিন্তু আজ এরা নীলের ছোপ মেখে নিল কী করে? তবে কি আমার আর পাহাড়ের মাঝখানে দীর্ঘ নীল বিস্তৃতি আমার চোখ দুটিকে নীলাঞ্জন– কিংবা নীল চশমা– পরিয়ে দিয়েছে যে আমি সব কিছুই নীল দেখছি?

ম্যাজিশিয়ানরা দেখেছি মাথার উপরে হাত তুলে এক প্যাক তাস ছেড়ে দেয় আর আলগা তাসগুলো জুড়ে গিয়ে ভাঁজে ভাঁজে নেমে আসে। এখানে যেন আকাশের অন্তরাল থেকে কোন এক জাদুকর আকাশ, পাহাড়, বন, জল এই হরতন, চিরতন, রুহিতন, ইশ্‌কাপনের চারখানা তাস জুড়ে দিয়ে ভাঁজে ভাঁজে লটকে দিয়েছেন। কিন্তু এ-ওস্তাদ লাল-কালোর দু-রং না নিয়ে, মেলাই তসবির না এঁকে, এক নীলের ভিন্ন ভিন্ন আভাস দিয়ে অপূর্ব এক ভেলকিবাজি দেখাচ্ছেন।

হ্রদের বুকে হাওয়া এতটুকু আঁচড় কাটেনি—একেবারে সম্পূর্ণ নিখিরকিচ। শুধু আমাদের লঞ্চ যেন চিরুনির মতো ইন্দ্রপুরীর কোনো এক রমণীর দীর্ঘ বিন্যস্ত নীলকুন্তলে সিঁথি কেটে কেটে সমুদ্র-সীমান্তের দিকে এগিয়ে চলেছে। সিঁথির দু-দিকে চূর্ণ কুন্তলের ফেনা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে কিন্তু এ-গরবিনীর কুন্তলদাম এমনই বিপুল যে চিরুনি বেশিদূর এগোতে না এগোতেই দেখতে পাই, দুদিকের ঘন কুন্তল সিঁথিকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে।

চতুর্দিকে অসীম শান্তি পরিব্যাপ্ত। শুধু লঞ্চের মোটরটার একখানা শব্দ কর্ণে পীড়া দেয়। সান্ত্বনা শুধু এইটুকু, এই নীলিমার সৌন্দর্য-মাধুরীতে ডুব দিলে কানে এসে মোটরের শব্দ পৌঁছয় না।

যোগশাস্ত্রে পতঞ্জলি চিত্তবৃত্তি-নিরোধের অনেক পন্থার নির্দেশ দিয়েছেন। এটা দিলেন না কেন?

এবারে সূর্যাস্ত। পশ্চিমের আকাশ হয়ে গিয়েছে টুকটুকে লাল। আকাশ যেন প্রথমটায় তাঁর নীল কপালের সিঁথিতে একফালি সিঁদুর মেখেছিলেন, তারপর তাঁর খোকা কচি হাতের এলোপাতাড়ি থাবড়া দিয়ে এখানে-ওখানে খাবলা খাবলা সিঁদুর লাগিয়ে দিয়েছে। মা শেষটায় সমস্ত মাথায় সিঁদুর মেখে নিয়েছেন।

নীলে লালে মিশে গিয়ে বেগুনি হয়? তাই বোধ হয় হ্রদের জল বেগুনি হয়ে গিয়েছে।

আজকের সূর্যাস্ত বড়ো অল্প সময়েই শেষ হয়ে গেল। আকাশে মেঘ থাকলে তারা সূর্যাস্তের লালিমা খানিকটে শুষে নেয় এবং সূর্য পাহাড়ের আড়ালে চলে যাওয়ার পরও মহফিল-শেষের তানপুরার রেশের মতো খানিকক্ষণ আকাশ-বাতাস জলস্থল রাঙিয়ে রাখে।

দিল্লির কবি গালিব সাহেব এই 'শেষ রেশটুকুর উপর হাড়ে হাড়ে চটা ছিলেন। তাঁর দুরবস্থা তখন চরমে। বাড়িখানা ঝুরঝুরে। এক বন্ধুকে চিঠি লিখেছিলেন, 'অগর পানী বরস্‌তা এক ঘণ্টা, তো ছৎ বরস্‌তি দো ঘণ্টে'—'জল যদি বর্ষে এক ঘণ্টা তো ছাত বর্ষে দু ঘণ্টা!'

দু-এক ঝাঁক পাখি এখানে ওখানে। পারিকুদের রাজাকে বললুম, 'দু-একটা মারো না।'

রাজার রাজকীয় চাল। পাখি দেখলে চাকরকে ধীরে সুস্থে বলেন, 'বন্দুকো।' চাকর রাজার রাজা! তার চাল আরও ভারিক্কি। আরও ধীরে সুস্থে কেস খুলে বন্দুক এগিয়ে দেয়। রাজা গদাইলস্করী চালে 'বন্দুকো' জোড়া লাগিয়ে বলেন, 'কার্তুজো'। করে, করে সব যখন তৈরি তখন পাখিরা সাইবেরিয়ায় চলে গিয়েছে। তবে কি রাজার তাগ খারাপ?

তবু ভদ্রতার খাতিরে দু-একটা গুলি ছুঁড়লেন। ফলং শূন্যং।

আমার একটা গল্প মনে পড়ে গেল।

বড়োলাট গেছেন বরোদায় পাখি শিকারে। আমাদের ওস্তাদ শিকারী রহমৎ মিয়া গেছেন সঙ্গে। সন্ধ্যায় যখন ওস্তাদ বাড়ি ফিরলেন তখন বাচ্চা শিকারীরা উদগ্রীব হয়ে শুধালে, বড়োলাট সায়েবের তাগ কী রকম?

ওস্তাদ প্রথমটায় রা কাড়ে না। শেষটায় চাপে পড়ে বললেন, 'বড়োলাটের মতো শিকারী হয় না, আশ্চর্য তাঁর তাগ। কিন্তু আজ খুদাতালা পাখিদের প্রতি সদয় (মেহেরবান) ছিলেন।'

পূর্ব-পশ্চিমে যেন দেখন-হাসি, ইলেকটিরিতে খবর পাঠাল, না বয়স্কা উটের নিশানে নিশানে কথাবার্তা। পশ্চিমের লালের ইশারায় পুব লাল হয়। সেই লাল ফিকে হচ্ছে—কী গোপন কায়দায় তার খবর পূর্বে পৌঁছচ্ছে? মাঝের বিস্তীর্ণ আকাশ তো ফিকে, কোনো রং নেই, ফেরফার নেই। কী করে এর হাসি ওর গায়ে গিয়ে লাগে, এর বেদনা ওর বুকের সাড়ায় প্রকাশ পায়?

আধা আলো-অন্ধকারে সাতপাড়া দ্বীপে নামলুম। আমবাগানের ভিতর ছোটো একটি ডাকবাংলো। লাঙ্গুর-আশ্রমের কাচ্চাবাচ্চারা কিচিরমিচির করছে। খানিক পরে চিল্কা হ্রদের তাজা মাছভাজার গন্ধ নাকে এল। সর্বাঙ্গে ক্লান্তি, কখন খেলুম, কখন ঘুমিয়ে পড়লুম, কিচ্ছু মনে নেই।

শেষ রাত্রে ঘুম ভাঙল। দেখি আমার অজান্তে বাতিওলারা এসে আসমানের ফরাশে এখানে ওখানে তারার মোমবাতি জ্বালিয়ে রেখে গিয়েছে। এবারে শেষ রাত্রের মুশায়েরা বসবে। আমগাছ মাথা দোলাবে, ঝিঁঝি নূপুর বাজাবে, পুবের বাতাস মজলিসের সর্বাঙ্গে গোলাপ-জল ছিটিয়ে ঠান্ডা করে যাবে।

তারপর দেখি দূর সাগরের ওপারে লাল মদের ভাঁড় থেকে চাঁদ উঠলেন ধীরে ধীরে, গা টেনে টেনে। সকলের মুখে হাসি ফুটল। অন্ধকার আকাশে যেসব মোসাহেবরা গা-ঢাকা দিয়েছিলেন তাঁদেরও চেনা গেল। ছোটো বাচ্চা যেমন মুশায়েরার মাঝখানে ঘুমিয়ে পড়ে, আমি আবার তেমন ঘুমিয়ে পড়লুম।

ভোর হলো। আজ আমার ছুটি শেষ। আপিসের কথা মনে পড়তেই সর্বাঙ্গ হিম হয়ে গেল। লঞ্চে উঠে পাড়ের পানে রওয়ানা দিলুম। সে সকালেও অনেক নবীন সৌন্দর্য দেখা দিয়েছিল, কিন্তু আপিসের জুজু আমার পঞ্চেন্দ্রিয় অসাড় করে দিয়েছে। যেন ডুবসাঁতার দিয়ে ডাঙায় পৌঁছে, আপিস আর অদৃষ্টকে অভিসম্পাত দিতে দিতে কটক এলুম।

(সংক্ষেপিত ও সম্পাদিত)

পটোদিদি

লীলা মজুমদার

পটোদিদিকে শেষবয়সে দেখেছি শামলা রং, মোটা শরীর, কথা বলার বিরাম নেই। কিন্তু ওই কাটা কাটা নাক-মুখ আর ইগল পাখির চাহনি নিয়ে এককালে যে সুন্দরী ছিলেন, সে-বিষয়ে কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না। ভারী স্বাধীন ও স্বাবলম্বী মানুষটি। বিয়ের সময় বাপ যেসব টাকাকড়ি, বাড়িঘর দিয়েছিলেন, সে-সমস্তই কোনকালে একে-ওকে ইত্যাদিকে বিলিয়ে, কিচ্ছু না-দিয়েই জীবনের শেষ কটা বছর দিব্য কাটিয়ে দিলেন।

নিজের আনাড়ি হাতে জোড়াতালি দেওয়া জামা আর সরু পাড়ের মিলের মোটা কাপড় পরনে; পায়ে সবুজ ক্যাম্বিসের জুতো, ভাইপোর বাড়ির দরজা-জানলায় সবুজ রং হবার সময় টিনে যেটুকু তলানি পড়ে ছিল, তাই দিয়ে স্বহস্তে রঞ্জিত।

আমাকে বললেন, 'কেন, সবুজ কি খারাপ রং, তাহলে আর গাছপালা সবুজ হতো না। তা ছাড়া কত সুবিধা ভেবে দ্যাখ, ময়লা হলেও টের পাবার জো নেই। অথচ এক পয়সা খরচ নেই। —আচ্ছা ওই মন্দির-প্যাটার্নের বড়ো বাড়িগুলোকে আলাদা টুকরিতে ভরে লাগেজ বাড়াচ্ছিস কেন?'

মধুপুরের পাট তোলা হচ্ছিল। আমি কর্মী, পটোদিদি উৎসাহী দর্শক। বলতে ভুলে গেছি যে তিনি আমার মায়ের বয়সি ননদিনি।

আমি বললাম, তা না-হলে কীভাবে নেব? ভেঙে যাবে যে। কষ্ট করে তৈরি করা।'

পটোদিদি বললেন, 'তাতে কী হয়েছে? বিছানার ভেতর প্যাক করে নিবি। কষ্ট করে

করা হলেও, জাপানি চিনেমাটির চায়ের সেটের চেয়ে তো আর দামি নয়। জানিস, আমার মেয়ে টেপু ওর জাপানি চায়ের সেট হোল্ড-অলে ভরে কলকাতা থেকে দিল্লি নিয়ে গেছিল!'

শুনে আমি এমনি প্রভাবিত হয়ে পড়লাম যে বাড়ি প্যাক করা বন্ধ করে বললাম, 'তাপ্পর কী হলো?'

পটোদিদি উঠে পড়লেন, 'কী আবার হবে? সব ভেঙে গেছিল নিশ্চয়!'

এইরকম ছিলেন আমার পটোদিদি। তিনি কিছু আমার মনগড়া গল্পের বইয়ের চরিত্র নন, সত্যিকার মানুষ। ভারতের প্রথম মহিলা অঙ্কে গ্র্যাজুয়েট। নাম ছিল স্নেহলতা মৈত্র। হয়তো ১৮৮৩ সালে জন্মেছিলেন। সাংসারিক দিক থেকে খুব একটা সুখী ছিলেন না। তবে দুঃখ-টুঃখ তাঁর গায়ে আঁচড় কাটতে পারত না। সম্পূর্ণ নিজের হাতে তৈরি এক অদৃশ্য জগতে বাস করতেন।

বগলে একটা পরিষ্কার ন্যাকড়া দিয়ে বাঁধা পুটলি থাকত আর একটা তালিমারা কালো পুরুষদের ছাতা। বলতেন, ওই পুঁটলিতে যা আছে তাই দিয়ে সংসারের যাবতীয় প্রয়োজন মেটানো যায়। ঐহিক এবং পারত্রিক। দুটো লেবু, গুটি চারেক মিয়ে-যাওয়া বিস্কুট, একটা রুদ্রাক্ষের মালা, পরমহংসদেবের ছোট্ট একটা ছবি। ব্যস আর কী চাই! পরমহংসদেব নাকি ছোটোবেলায় ওঁকে কোলে করেছিলেন, তাই আজ পর্যন্ত কেউ তাঁর এতটুকু অনিষ্ট করতে পারেনি।

পাঁচ ভূতে যে তাঁর বাপের-দেওয়া যথাসর্বস্ব খসিয়ে নিয়েছে, তাকে তো আর সত্যিকার ক্ষতি বলা যায় না। একবার একটা স্কুলের পুরস্কার বিতরণ সভায় পুঁটলি বগলে পটোদিদিকে দেখেছি, সেকালে লাট-মেম লেডি উইলিংডনের সঙ্গে বিশুদ্ধ ইংরেজিতে গল্প করছেন। মেম আহ্লাদে আটখানা। না-জানি কী রসের গল্পই বলেছিলেন পটোদিদি।

মাথাখানা অঙ্কে ঠাসা ছিল। বাস্তবিক এমনি অঙ্কের মাথা আমি আর কোনো মেয়ের দেখিনি, যদিও আমি নিজে অঙ্কে একশোতে একশো পেতাম। পঞ্চাশ বছর আগে যা যা শিখেছিলেন তার এক বর্ণ ভোলেননি, না অঙ্ক, না সংস্কৃত। চর্চার অভাব তাঁর কিচ্ছু করতে পারত না। একটা টুল টেনে নিয়ে অমনি বি এ ক্লাসের ছেলে-মেয়েদের অঙ্ক বোঝাতে বসে গেছেন। অমনি যত রাজ্যের জটিল সমস্যা জলের মতো পরিষ্কার হয়ে যেত।

আর শুধু অঙ্কের কেন? সক্কলের সব সমস্যা মেটাবার আশ্চর্য সব উপায় ঠাওরাতে পারতেন। একদিন বললেন, 'ধোপার বাড়ির কাপড়ের সঙ্গে বাড়িতে ছারপোকা এসেছে তো কী হয়েছে? ছারপোকার জায়গায় একটু ঝোলা-গুড় মাখা। তারপর শিশিতে ভরে কিছু লাল পিঁপড়ে এনে ছেড়ে দে। সব ছারপোকা খেয়ে তো শেষ করবেই, তোদেরও কামড়াবে!'

আমরা শিউরে উঠলাম। 'কী সর্বনাশ! তারপর লাল পিঁপড়ে যাবে কীসে?' পটোদিদি তাচ্ছিল্যের সুরে বললেন, 'তারও নিশ্চয়ই সহজ উপায় আছে, খোঁজ করে দেখ।'

আরেক দিন বললেন, 'মধুপুরের এই গরমে ছাদ গরম হবে না তো কী হবে? তার তো সহজ ওষুধই আছে। নর্দমার সব ময়লা জল ছাদে ফেলবি। ঘর কেমন ঠান্ডা না হয় দেখব! তা গন্ধ একটু হবেই। কিন্তু ময়লাগুলো শুকিয়ে কী চমৎকার সার হবে বল দিকিনি!'

সেকালে রেফ্রিজারেটর ছিল না কারো বাড়িতে; মধুপুরে সহজে বরফও কিনতে পাওয়া যেত না। পটোদিদি বললেন, 'সে কী! জল ঠান্ডা করতেও জানিস না? এক কলশি জলের চারদিকে সপসপে ভিজে তোয়ালে জড়িয়ে, চড়চড়ে রোদে বসিয়ে রাখ ঘণ্টাখানেক। বরফের মতো ঠান্ডা হয়ে যাবে!' বাস্তবিক তাই। করে দেখেছি। তোয়ালেও শুকোলো, জলও হিম।

আরেকবার বলেছিলেন, 'লংকার গন্ধ চাই, কিন্তু ঝাল হলে চলবে না? সে আর এমন কী শক্ত! রান্না হয়ে গেলে, কড়াইসুদ্ধ ঝোল নামিয়ে, ওই টগবগে গরম ঝোলে গোটা বারো বোঁটাসুদ্ধ ঝাল কাঁচা লংকা ছেড়ে, ঢাকা দিয়ে দিবি। ৫ মিনিট বাদে লংকাগুলো তুলে ফেলে, তরকারি ঢেকে রাখিস। সুগন্ধে ভুরভুর করবে।' এও করে দেখেছি, অব্যর্থ।

একদিন পটোদিদি হঠাৎ বললেন, 'দেখ, একবার আমার মাথাটার কী যেন হলো। খালি মনে হতে লাগল আমি আমি নই। আমি আমার ছোটো বোন বুড়ু। এ তো মহা গেরো! বুড়ুই যদি হলাম, তবে আমি এ-বাড়িতে কেন? আমার তো বুড়ুর বাড়িতে চলে যাওয়া উচিত। আচ্ছা, আমি সত্যি বুড়ু তো? আয়নার কাছে গিয়ে দেখতাম, হ্যাঁ, এ যে বুড়ু তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ওই তো বুড়ুর নাক-মাথা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

কিন্তু হুট করে তার বাড়িতে গিয়ে না-উঠে, একবার পরখ করে দেখাই ভালো, আমি আমি, না আমি বুড়ু।

সঙ্গে সঙ্গে ট্রিগনোমেট্রির বইখানা নামিয়ে খুব খটমট দেখে একটা বুদ্ধির অঙ্ক কষে ফেললাম। তারপর যেই-না পাতা উলটে দেখলাম এক্কেবারে ঠিক হয়েছে, কোথাও এতটুকু খুঁত নেই, তখন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। নাঃ, ও অঙ্ক কষা বুড়ুর কম্ম নয়। তাহলে আমি নিশ্চয় আমিই!'

এইরকম ছিলেন আমার পটোদিদি। ১৯৬০ সালে স্বর্গে গিয়ে কী করছেন কে জানে।

আমার ছোটোবেলা

আশাপূর্ণা দেবী

আমার ছেলেবেলা? সে কি আজকের কথা বাপু? কলকাতার রাস্তায় তখন পালকি চলত। ভাবো?

আহা, এখনো কোনো ঝিমঝিমে দুপুরে যখন ঘরের মধ্যে চুপচাপ শুয়ে থাকি। হঠাৎ হঠাৎ যেন কোন সুদূর থেকে পালকি বেহারাদের সেই হুকুম হাকুম হুকুম হাকুম আওয়াজ বুকের মধ্যে এসে ধাক্কা মেরে চলে যায়। আর তখন চোখ বুঝে ভাবতে ইচ্ছে করে, শব্দটা উত্তর কলকাতার একটা বারান্দাওয়ালা বাড়ির সামনে এসে থামল। আর 'ঘাগরা' পরা একটা ছোট্ট মেয়ে ছুটে বারান্দায় এসে মুখ ঝুঁকিয়ে দেখতে পেল, মাটিতে নামানো পালকি থেকে কৌশলে আগে একটা পা বার করে, তারপর হেঁট করা মুণ্ডুটা বার করে আর তারপরে সমস্ত শরীরটাকে নিয়ে বেরিয়ে এলেন বড়ো মাসিমা, কি মেজদিদিমা। ঝামাপুকুরের ভাবিনীপিসি, অথবা ফড়েপুকুরের নেত্যঠানদি।

এঁরাই আসতেন। মাঝে মাঝেই।

একা একা। হ্যাঁ, তা এঁদের একা-আসায় ভয় ছিল না। কারণ এঁদের পরনে থান, গায়ে গহনার বালাই নেই, মাথা ন্যাড়া। কী করবে চোরডাকাত? আর একা আসতে হলে পালকি ছাড়া গতি কি? রিকশা তো আর ছিল না। রিকশার নামও শোনেনি তখন কলকাতা।

চোখ বুজলে দেখতে পাই—সুকৌশলে বেরিয়ে এলেন। মাটিতে দাঁড়ালেন, আঁচলের গিঠ খুলে ভাড়া মিটিয়ে দিলেন।

চার-চারটে গাঁট্টাগোট্টা পালকি বেহারা সোয়ারি নামিয়ে দিয়ে তেলচিটে গামছা দিয়ে গায়ের ঘাম মুছতে মুছতে, চকচকে ছোট্ট একটা গোল 'দুয়ানি' নিয়ে হৃষ্টবদনে, ফের পালকি উঠিয়ে নিয়ে চলে গেল। স্রেফ একটা মাত্র দুয়ানি। এর ওপর যদি আবার কোনো দয়াবতী সোয়ারি বাড়তি একটি তামার পয়সা ছুড়ে দিয়ে বলতেন, 'অনেক ঘেমেছিস, নে জলপানি খেগে যা—' তাহলে সেই চারখানি মুখের আট পাটি দাঁত? আহা যেন রোদলাগা আয়নার মতো ঝলসে উঠত।

বড়ো 'অল্পে সন্তুষ্ট' কাল ছিল বাপু আমাদের ছেলেবেলার কালটি। 'লোকজন' অল্পে সন্তুষ্ট, ছেলেপুলে অল্পে সন্তুষ্ট, ধোবা-নাপিত, মুটে বেহারা গাড়োয়ান—সবই ওই।

ধোবাকে (মানে আমি যাকে দেখেছি তাকে) যদি দু'কুড়ি কাপড় জামার সঙ্গে, গোটা দশ-বারো ছোটো জামা-ফ্রক, পাঁচহাতি ধুতি, শাড়ি, ফাউ কাচতে দিয়ে, দুটো পয়সা 'জল খাস' বলে ফেলে দেওয়া হতো, আহ্লাদে বিগলিত হয়ে যেত সে। নাপিত? সে তো বড়োদের চুল ছাঁটার সময় দু'চারটে ছোটো মাথা অবলীলায় অক্লেশে 'ফাউ' বলে ধরে নিয়ে পুঁচিয়ে ছেঁটে দিয়ে চলে যেত। তবে তাদের ন্যাড়া করতে হলে অবশ্য নগদ একটা ডবল পয়সা দিতে হতো। সে পয়সা তোমরা নিশ্চয় চোখেও দেখনি? গোলগাল ভারীসারি একটি তামার চাকতি। 'ন্যাড়ামাথা রাজার' (সপ্তম এডোয়ার্ডের) মুখ আঁকা।

যাক—তোমরা হয়তো বলে বসবে ধোবা নাপিতের গল্প আবার কী শুনব? শোনালাম কেন জানো? শুধু ওই কথাটি বলতে, আমরা ছেলেবেলায় সন্তুষ্ট মুখের ছবিটা যে কেমন, তা দেখেছি। সে জিনিসটি যে কী, তোমরা দেখতে পাও? আশে পাশে, ধারে কাছে, আয়নার সামনে?

তোমাদের একালের ছোটোদের তো দেখি মুখের বুলিই হচ্ছে, 'ধেৎ! ভাল্লাগছেনা।' কেন যে 'ভাল্লাগছে না' তা হয়তো তোমরা নিজেরাই জানো না। আসল কথা আশেপাশে কেবলই 'না ভালোলাগা' মূর্তি দেখে দেখেই এই অবস্থা। আমাদের ছেলেবেলায় বাপু আমাদের সবসময় খু-ব ভালো লাগত। 'ভাল্লাগেনা' শব্দটাই জানতাম না।

সকালবেলা উঠে শুধু শুধুই ভালো লাগছে সেই 'অকারণ ভালোলাগা'র সোনালি পাতাটি দিয়ে মোড়া আছে আমার ছেলেবেলা। অথচ দ্যাখো কীই-বা ছিল তখন? এ যুগের পক্ষে 'কিছুই না'। গ্রামগঞ্জের কথা বাদ দাও, এই খাস কলকাতা শহরের যা যা ছিল না, তা শুনলে তোমাদের চোখ গোল্লা হয়ে যাবে। খাস কলকাতারই মেয়ে তো আমি, এখানেই বড়ো হয়েছি। এখনো এখানে বসে বসেই বুড়ো হচ্ছি। আর দেখে চলেছি কতই পরিবর্তন।

তবু একথা তো স্বীকার করতেই হবে, সেই গৌরবের দিনেও কলকাতায় কী কী ছিল না তার তালিকা করতে বসলে, স্রেফ একখানা 'ছিল না'-র অভিধান হয়ে যাবে।

আমাদের ছেলেবেলায় শুধু যে রিকশাই ছিল না তা নয়, বাসও ছিল না। বাসের নামও জানা ছিল না। ভাবতে পারো? ছিল শুধু ট্রাম গাড়ি। আর ঘোড়ার গাড়ি। অবশ্য ঘোড়ার রকম রকম গাড়ি। ল্যান্ডো, ফিটন, ব্রুহাম, টমটম এবং ছ্যাকড়া।

মোটরগাড়ি এক-আধটা দেখা যেত বটে, সাহেব সুবোদের, কিংবা নেহাৎ বড়োলোকদের। হুডখোলা গাড়ি। হাওয়া গাড়িই বলা হতো বেশিরভাগ। ট্যাক্সি? কই?

আমাদের ছেলেবেলায় 'সার্বজনীন পুজো' ছিল না, মাইক ছিল না, টুনিবাল্ব ছিল না, পুজোর জন্য চাঁদা চেয়ে চেয়ে বেড়ানো ছিল না। ভদ্রবাড়ির মেয়েদের রাস্তায় বেরোনোর নিয়ম ছিল না। আকাশবাণী, হাওয়াই জাহাজ ছিল না। তা রিকশা গাড়িই যখন ছিল না, তখন কি আর এরোপ্লেন থাকবে? ছিল না। আমরা একটু বড়ো হবার পর উঠল। সে কী উৎসাহ উত্তেজনা। আকাশে সাড়া পেলেই ছুট ছুট ছাতে ছুট। এরোপ্লেনকে দেখে বিশ্বাস করতেই হলো মেঘনাদের মেঘের আড়ালে থেকে 'বিমান যুদ্ধ'টা নেহাৎ বানানো গল্প নয়। 'মেঘনাদ' মানে তো মেঘের গর্জন? তা এরোপ্লেনের গর্জনটা ঠিক তাই নয় কি?

এই ভাবতে খুব ভালো লাগত আমার। রামায়ণ-মহাভারতের গল্প তো সেই কোন ছোট্টবেলা থেকেই শুনতাম।

লোডশেডিং বলে যে একটা ভাষা সৃষ্টি হবে সেই ধারণাই কি ছিল? ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ বাতি তো ছিল না। কাজেই বিদ্যুতজনিত যা কিছু তার সবই বাদ দিতে পারো নির্ভয়ে নিশ্চিন্তে।

বিজ্ঞানের অবিশ্বাস্য উন্নতি আর আরাম-সুবিধের যত কিছু উপকরণ সবই বিগত পঞ্চাশ-ষাট বছরের মধ্যেই ঘটেছে আর হয়েছে। কাজেই তোমাদের যা আছে তার সাত ভাগের এক ভাগও ছিল না আমাদের। কিন্তু তা

বলে ভেবো না লোকের জাঁকজমক সমারোহ ছিল না। সে শুনলে আবার তোমরা হাঁ হয়ে যাবে। বর বিয়ে করতে যাবার সময় ফুল-সাজানো মোটরগাড়ি অবশ্য দেখতে পাওয়া যেত না। কিন্তু যা দেখা যেত সে কম নয়। রাস্তায় ব্যাগপাইপে ইংরেজি বাজনা, গোরার বাদ্যি'র রব উঠলেই ছোট জানলায় বারান্দায় ছাতে। কারণ এ হচ্ছে ঘটার বরযাত্রা।

আর ঘটার হলেই চার ঘোড়ার, আট ঘোড়ার, ষোলো ঘোড়ার, এমনকী বত্রিশ ঘোড়ার গাড়িও দেখা যেতে পারে। তার সঙ্গে ওই ইংরেজি বাজনা, আর অ্যাসিটিলিন গ্যাসবাতির আলোকসজ্জার শোভাযাত্রা। তেমন বেশি জাঁকজমক হলে, কাগজের তৈরি বৃহৎ বৃহৎ পুতুলের শোভাযাত্রা। হাতির সমান মাপে হাতি, ঘোড়ার মাপে ঘোড়া, উট প্রমাণ উট, তাছাড়া—দশমুণ্ড রাবণ, নাক কান কাটা সূর্পনখা, হাত-পা ছড়ানো তাড়কা রাক্ষুসী। আবার রামসীতা, রাধাকৃষ্ণ, হরপার্বতী এসবও থাকত।

ওইসবের মধ্যে দিয়ে কপালে জরির ঝালর ঝোলানো ঘোড়ারা যখন কদমে কদমে ছুটত, সত্যিই একটা দৃশ্য ছিল।

ছেলেবেলার গল্প শুরু করার বিপদ আছে। স্মৃতির সমুদ্রটি উথলে ওঠে।

মনে পড়ে যায় বিজয়াদশমীর আনন্দ। সরস্বতী পুজোর উৎসব। তবু তো শুধু দোয়াত কলমের পুজো। তবু কী উত্তেজনা। বাসন্তী রঙের কাপড় পরাই চাই। পুজোর আগে যেন কুল খাওয়ার চিন্তাও না করি। ... পুজোর দিনে যেন ফস করে এক লাইন পড়ে না ফেলি।...

আগের রাত্রে দেয়ালে ঝোলানো ক্যালেন্ডারগুলো উলটে উলটে রাখা হচ্ছে; বইখাতা সরিয়ে রাখা হচ্ছে, পাছে ছুঁয়ে বসি। নিষ্ঠার সেই আনন্দ, বড়ো সুখের। রথ দোল কীসে না আমোদ? ছোটো ছোটো মাটির রথ টানাতে আমোদ। দোল খেলা তো অবশ্য খুব মাত্রা মাপা ছিল আমাদের। কিন্তু প্রধান আনন্দ তো পার্বণীর।

পালেপার্বণে একটি করে চকচকে রুপোর দুয়ানি পাওয়া যেত। তখন সেটাই রাজ ঐশ্বর্য! সেটা নিয়ে কী করা হবে। তিনবোনে মিলে দু-চার দিন ধরে পরামর্শ চলত। ক্ষীরের কুলপি? গোলাপি রেউড়ি নকুলদানা? কাঁচকড়ার পুতুল? ফুঁকো মালা? লাল ফিতে? দিদি রেগে বলত, 'যা যা, যতই বলিস তুই তো শেষ অবধি সেই বুলটানা খাতা কিনে পয়সাটা খরচা করে ফেলবি।'

কথাটা সত্যি। এই একটা জিনিসে দারুণ দুর্বলতা ছিল আমার ছেলেবেলায়। বুলটানা খাতা। দু-আনায় দু-খানা পাওয়া যেত। মলাট বাঁধানো হলে একটা। পয়সা হাতে পেলেই এ ইচ্ছেটা পেয়ে বসত। খাতাটা কেনা হলেই, পয়সা সার্থক।

একবার আমার সেজদার একখানা হারানো বই খুঁজে দেওয়ার পুরস্কারস্বরূপ, সেজদা আমায় শক্ত মলাটের ইয়া মোটকা একখানা খাতা উপহার দিয়েছিলেন। যদিও সেজদাও তখন 'স্কুলবয়', তবু নিজের টিফিন-ফিফিনের পয়সা থেকেই দিয়েছিলেন আর কি।... আহা সেজদাকে সেদিন স্বর্গের দেবতা মনে হয়েছিল। আর ওই বুলটানা মোটকা খাতাটাকে স্বর্গের একটা টুকরো। আহা সে আমাদের স্মৃতি আজও যেন মনের মধ্যে ঝকমকে হয়ে আছে। তারপর তো জীবনে কতই প্রাপ্তি ঘটেছে, কিন্তু জীবনে সেই প্রথম স্নেহের উপহার, যা কেউ আমার মনটা বুঝে নিয়ে দিয়েছে তার কী তুলনা হয়? ভালোবাসাকে বুঝতে পারা, স্নেহকে অনুভব করা, এটা ছিল আমাদের কালে। খাতাটার দাম ছিল নাকি চার আনা। মাকে একবার বলতে শুনেছিলাম, একখানা খাতার দাম চার চার আনা পয়সা! বাবাঃ ক্রমশই জিনিসপত্তরের দাম কী বেড়েই যাচ্ছে।...

'ছেলেবেলা'র পাওয়া সেটাই হচ্ছে পরম-পাওয়া, তার স্বাদই আলাদা। সোনালি স্তবকে মোড়া থাকে সেই পাওয়ার স্মৃতি।

(সংক্ষেপিত ও সম্পাদিত)

অনুবাদ সাহিত্য

শামুক

অনুপমা বসুমাতরি

একদিন ধানগাছের ফাঁকে ফাঁকে উপুড় প'ড়ে-থাকা শামুকদের
আমি খালুইতে তুলে নিয়েছিলাম যতক্ষণ-না খালুই ভ'রে গিয়েছিল
আর সেদ্ধ করার আগে ডেকচির ঢাকনি তুলে খুব খুশি হ'য়ে গিয়েছিলাম
শামুকরা খোলার ভেতর তাদের আস্ত শরীরটাই গুটিয়ে নিয়েছিল
আমি এক টিপুনিতেই ভেতর থেকে বার ক'রে এনেছিলাম সব মাংস আর মজ্জা
মেঝের খাবার জায়গায়

খোলাগুলো ভেঙে গিয়েছিল মড়মড় ক'রে আর তার মধ্যে কেমন-একটা অদ্ভুত ছন্দ ছিল
যার মধ্যে লুকিয়েছিল মরা শামুকগুলোর শোক তাপ বিলাপ।

সেই ছন্দটির উৎস হাতড়ে আমি এখন হামাগুড়ি দিয়ে বেড়াই
সাগরের পারে-পারে, বেয়ে বেয়ে উঠি জলে-ডাঙায়
হু হুয়াই ওঠে ঢেউয়ের আওয়াজ আর আমি তার কবলে প'ড়ে যাই
আর বারে-বারে ভেসে-ভেসে উঠি
আশ্চর্যভাবে কোন্-এক অদৃশ্য হাত আমার শরীরটা তুলে নিলে
এবার এক টিপুনিতেই নিংড়ে বার ক'রে নিলে আমার নিজের ভেতরটাকে।

বুক ভেঙে যাবার যন্ত্রণাতেই মড়মড় ক'রে ভেঙে যাচ্ছে আমার শরীরের খোলা
আর সৃষ্টি হ'য়ে গেছে আরো এক নতুন বিলাপগাথার ছন্দ।

তরজমা : মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

বাজি

আন্তন চেখভ

শরতের অন্ধকার রাত। বৃদ্ধ মহাজন বসার ঘরে পায়চারি করে চলেছেন। বারবার তাঁর মনে পড়ছে পনেরো বছর আগে শরৎকালে তিনি যে পার্টি দিয়েছিলেন, তার কথা। সেই পার্টিতে ছিল অনেক গুণীজ্ঞানী লোক, আলোচনা হয়েছিল নানা ইন্টারেস্টিং বিষয় নিয়ে। আলোচ্য বিষয়ের একটি ছিল প্রাণদণ্ড। অতিথিদের বেশির ভাগই প্রাণদণ্ডের বিরুদ্ধে রায় দিয়েছিলেন। কেউ-কেউ বলেছিলেন প্রাণদণ্ডের বদলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড অনেক ভালো।

মহাজন মন্তব্য করেছিলেন, 'আপনাদের কথায় সায় দিতে পারছি না। আমার অবশ্য প্রাণদণ্ড কিংবা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের অভিজ্ঞতা নেই। কিন্তু মানবতার দিক দিয়ে, নৈতিক দিক দিয়ে, আমার মনে হয় প্রাণদণ্ড অনেক ভালো। প্রাণদণ্ড দিলে মৃত্যু হয় সঙ্গে সঙ্গে, কিন্তু যাবজ্জীবন কারাদণ্ড তিলে তিলে মারে।'

একজন অতিথি মন্তব্য করেন, ‘মানবতার দিক থেকে দুটোই সমান খারাপ। এ-দুটোরই উদ্দেশ্য একটা জীবন ধ্বংস করা। রাষ্ট্র তো ভগবান নয়। যে জিনিস দিতে পারে না সে জিনিস নেবার অধিকার রাষ্ট্রের নেই।’

অতিথিদের মধ্যে ছিলেন এক আইনজীবী। বয়েস তার পঁচিশের কাছাকাছি। এ বিষয়ে তাঁর মতামত জানতে চাইলে তিনি বলেন :

‘নীতির দিক থেকে প্রাণদণ্ড কিংবা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দুটোই সমান খারাপ। কিন্তু আমি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডেরই পক্ষে। না বাঁচার চেয়ে বেঁচে থাকা ভালো।’

এই মন্তব্যের পর শুরু হয়ে যায় ধুমাধুম তর্কবিতর্ক। মহাজনের বয়েস তখন কম। দারুণ চটে টেবিলে ঘুসি মেরে তিনি সেই তরুণ উকিলকে বলেন :

‘আপনি একেবারে বাজে বকছেন। কুড়ি লাখ বাজি ফেলে বলতে পারি পাঁচ বছরও আপনি কয়েদখানার ঘরে একা থাকতে পারবেন না।’

‘এ নিয়ে সত্যি-সত্যি বাজি ধরতে চান? আমিও তাহলে বাজি ধরছি—পাঁচ কেন পনেরো বছর কয়েদখানায় একা ঘরে থাকতে আমি রাজি।’

‘পনেরো বছর থাকবেন! বেশ রাজি! আপনারা শুনুন—আমি বাজি ধরলাম কুড়ি লাখ।’

‘মেনে নিলাম। আপনি বাজি ধরলেন কুড়ি লাখ, আমি—আমার স্বাধীনতা।’

এই হাস্যকর বাজি পাকাপাকি হয়ে যায়। মহাজনের তখন এত লাখ-লাখ অর্থ যার গোনাগুনি নেই। তাঁর তখন অর্থের গরম। দারুণ খুশি হয়ে খাবার সময় সেই তরুণ উকিলকে ঠাট্টা করে তিনি বলেন :

‘এই বাজিটার কোনো মানেই হয় না। হয় আপনি আপনার জীবনের পনেরো বছর হারাবেন, না-হয় আমার লোকসান হবে কুড়ি লাখ। কিন্তু তাতে লোকে কি বুঝবে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের চেয়ে প্রাণদণ্ড খারাপ? না, না, একদম বাজে। আমি বাজি ধরেছি নেহাত একটা খেয়ালখুশির বশে—আর আপনি—সোনার লোভে।’

আজ তাঁর মনে পড়ছে সেই সান্ধ্যপার্টির পরের ঘটনাগুলো। স্থির হয় মহাজনের বাড়ির বাগানের এক কোণের ঘরে সেই উকিলকে বন্দি থাকতে হবে। কড়া নজর রাখা হবে তাঁর উপর। এ-বিষয়ে দুজনেই তাঁরা একমত হন যে বন্দিদশায় উকিল ঘর ছেড়ে বেরুতে পারবেন না, লোকজনের সঙ্গে দেখা করতে পারবেন না, কোনো মানুষের স্বর পাবেন না শুনতে এবং পাবেন না কোনো চিঠিপত্তর আর খবরের কাগজ। উকিলকে অবশ্য দেওয়া হবে একটা পিয়ানো, বই, চিঠি লেখার অনুমতি...। সেই ঘরে ছোট্ট জানলা দিয়ে তিনি তাঁর চাহিদার কথা কাগজে লিখে জানাতে পারবেন। পড়ার বই, গানের বই ইত্যাদি চাইলেই তিনি পাবেন। ১৮৭০ সালের ১৪-ই নভেম্বরের মাঝরাত থেকে ১৮৮৫ সালের ১৪-ই নভেম্বরের মাঝরাত পর্যন্ত উকিলকে থাকতে হবে বন্দি হয়ে। উকিল যদি এই সময়ের মধ্যে দু মিনিটের জন্যেও পালাবার কোনো চেষ্টা করেন তাহলে মাহাজন বাজি জিতবেন, উকিল হারবেন।

বন্দিদশার প্রথম বছরে উকিল যেসব চিরকুট পাঠাতেন সেগুলি থেকে বোঝা যায়, তিনি অত্যন্ত একলা বোধ করতেন, তাঁর খুবই একঘেয়ে লাগত। তাঁর সেই বন্দি-ঘর থেকে দিনরাত শোনা যেতো পিয়ানোর শব্দ। মদ এবং তামাক একেবারেই তিনি খেতেন না। তিনি লেখেন, ‘মদে মাথায় নানা চিন্তা ঘোরে। যে-কোনো বন্দির কাছেই এইসব চিন্তা প্রধান শত্রু। তা ছাড়া খুব ভালো মদ একা একা বসে খেতে কারুরই ভালো লাগে না।

আর তামাক—তার তো কথাই ওঠে না—তামাকের গন্ধে ঘরের বাতাস বিষিয়ে ওঠে।'

প্রথম বছর সেই উকিল হালকা ধরনের নানান বই চেয়ে পাঠান—প্রেমের, রহস্যের, রূপকথার, হাসির গল্পের বই।

দ্বিতীয় বছর পিয়ানোর শব্দ আর শোনা যায় না। উকিল তখন চেয়ে পাঠান শুধুই ধ্রুপদি সাহিত্যের বই। পঞ্চম বছরে আবার শোনা যায় পিয়ানোর শব্দ। পুরো বছরটাই তিনি ভালো-ভালো খাবার খেয়ে, বিছানায় শুয়ে কাটিয়ে দেন। তখন নাকি তিনি প্রায়ই আড়মোড়া ভাঙতেন আর নিজের মনেই খুব চটে নানান কথা বলে চলতেন। বই তখন তিনি একেবারেই ছুঁতেন না। মাঝে-মাঝে রাতে উঠে তিনি লিখতে বসতেন। বহুক্ষণ তিনি লিখতেন, তারপর সকালে যা লিখেছিলেন তা ছিঁড়ে ফেলতেন। অনেকবার তাঁকে কাঁদতেও শোনা যায়। ষষ্ঠ বছরের শেষদিকে বন্দি খুব মন দিয়ে ভাষা, দর্শন এবং ইতিহাস পড়তে শুরু করেন। এইসব বিষয়ে এত রাশি-রাশি বই তিনি চেয়ে পাঠাতে থাকেন যে মহাজনের পক্ষে সেগুলি সংগ্রহ করা দায় হয়ে ওঠে। বই পড়ার সেই নেশাগ্রস্ত সময় বন্দি মহাজনকে লেখেন : 'বন্ধু, ছটি ভাষায় এই চিঠি আপনাকে লিখছি। যাঁরা ভাষাবিদ তাঁদের দেখাবেন। তাঁরা যদি একটিও ভুল বার করতে না পারেন তাহলে বাগান থেকে আপনি দু-বার গুলি ছুড়বেন। সেই শব্দ থেকে আমি বুঝবো আমার ভাষা শেখার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়নি। যাঁরা মহান লেখক তাঁরা বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ভাষায় লিখেছেন। কিন্তু তাঁদের সবাইকার মধ্যে জ্বলছে একই শিখা, সেই শিখার সন্ধান পেয়েছি। যদি জানতেন আজ আমার কী আনন্দ! বন্দির এই অনুরোধকে স্বীকার করে নেওয়া হয়, মহাজনের আদেশে বাগান থেকে ছোড়া হয় দু-বার বন্দুক।

দশম বছরে সেই উকিল স্থির হয়ে বসে শুধু পড়ে চলেন নিউ টেস্টামেন্ট। মহাজন তাতে অবাক হয়ে যান—যে লোকটা চার বছরে ছশো জটিল বই পড়েছে কী করে সে এক বছর ধরে এমন একটি বই পড়ে চলতে পারে যেটা ছোট্ট, যেটার ভাষা সহজ, যেটা বুঝতে কোনো অসুবিধেই নেই। নিউ টেস্টামেন্টের পর বন্দি চেয়ে পাঠান ধর্ম, ইতিহাস ও অধ্যাত্মবিদ্যা সম্বন্ধে হরেকরকম বই।

বন্দিদশার শেষ দু-বছরে বন্দি পাগলের মতো এলোমেলো অসংখ্য বই পড়ে। কখনও বা বিজ্ঞান, কখনও বা বায়রন, কখনও বা শেক্সপিয়র, কখনও বা রসায়ন, চিকিৎসাশাস্ত্র, উপন্যাস, দর্শন বা ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধে বই। তাঁর পড়া দেখে মনে হয় যেন এমন একটা সমুদ্রে তিনি ভাসছেন, যেখানে জাহাজ টুকরো টুকরো হয়ে গেছে আর তিনি চাইছেন ভাঙা জাহাজের কোনো একটা টুকরো ধরে নিজেকে বাঁচাতে।

দুই

এইসব কথা মহাজনের মনে পড়তে লাগলো।

মনে-মনে তিনি বললেন : 'কাল রাত বারোটায় উকিল মুক্তি পাবে। বাজির শর্ত অনুযায়ী তাকে দিতে হবে বিশ লাখ। দিলে আমি তো একেবারে ফতুর, না-না, ফতুর নয়, খতম।'...

পনেরো বছর আগে তাঁর লাখ-লাখ অর্থ ছিল। এখন তাঁর কোনটা বেশি অর্থের অঙ্ক, না দেনার অঙ্ক? ভাবলেই বুক তাঁর কেঁপে ওঠে। ফাটকাবাজি ছিল তাঁর নেশা, অর্থকে খোলামকুচির মতো দু-হাতে ছড়ানো ছিল তাঁর শখ। এই বৃদ্ধ বয়সেও সেটা তিনি কাটিয়ে উঠতে পারেননি। এই নেশায় আর শখে ক্রমশ তাঁর ব্যাবসা

জোয়ার থেকে ভাটার শেষ সীমায় পৌঁছেছে। সেই দুঃসাহসী মহাজন—একসময় দেমাকে মাটিতে যাঁর পা পড়তো না—নেমে এসেছেন একেবারে সাধারণ স্তরে। বাজারদরের উঠতি-পড়তিতে বুক তাঁর দুরদুর করে।

মাথায় হাত দিয়ে তিনি বিড়বিড় করে চললেন, 'বাজি, বাজি—হতচ্ছাড়া বাজি। লোকটা মরে না কেন? এখন তো সবে তার চল্লিশ বছর। আমার শেষ কানাকড়িটাও তার হাতে তুলে দিতে হবে। সে বিয়ে করবে, ফুর্তি করবে, ফাটকাবাজি খেলবে। আর আমি ভিখিরির মতো শুধু জুলজুল করে তাকিয়ে থাকব আর রোজ তার কাছ থেকে শুনব, 'আমার জীবনের সব সুখ দিয়েছেন আপনি। আপনাকে আমায় সেবা করতে দিন।'—

'না-না, এটা আমি বরদাস্ত করতে পারব না। এই সর্বনাশ, এই অপমানের হাত থেকে আমি বাঁচতে পারি—লোকটা যদি মরে।'

অন্ধকার রাত। বাড়ির সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে, বাইরে শুধু শোনা যায় ঠান্ডায় জমে যাওয়া গাছ আর বাতাসের চাপা কান্না। পা টিপে-টিপে গিয়ে সিন্দুক থেকে একটা চাবি বার করে ওভারকোটের পকেটে তিনি রাখলেন। এটা সেই দরজার চাবি, গত পনেরো বছর যেটা খোলা হয়নি। তারপর চোরের মতো বেরুলেন তিনি বাড়ি থেকে। বাগানটা কনকনে অন্ধকার। বৃষ্টি পড়ছে। হাড়-কাঁপানো ভিজে হাওয়া আর্তনাদ করে চলেছে। বাগানের গাছগুলো উঠছে শিউরে-শিউরে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তিনি তাকালেন। কিন্তু কিছুই তার চোখে পড়ল না—না জমি, না সাদা-সাদা মর্মরমূর্তি, না কোনো গাছ। বাগানের শেষ প্রান্তে গিয়ে চৌকিদারকে দু-বার তিনি ডাকলেন। কোনো উত্তর এল না। স্পষ্ট বোঝা গেল লোকটা এই দুর্যোগের হাত থেকে নিস্তার পাবার জন্যে কোথাও গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। রান্নাঘর কিংবা চারাগাছ রাখার কাচের ঘরে ঘুমুচ্ছে।

বৃদ্ধ ভাবলেন, 'মতলবটা হাসিল করতে পারলে সন্দেহটা প্রথমে নিশ্চয়ই পড়বে চৌকিদারের ওপর।' অন্ধকারে হাতড়ে-হাতড়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠে বাগানের সেই কোণের বাড়ির দরজা খুলে একটা সরু বারান্দা পেরিয়ে হলঘরে এসে তিনি দেশলাই জ্বাললেন। জনমানব নেই সেখানে। শুধু একটা খাট, তাতে বিছানা-চাদর কিছুই নেই। কোণে একটা লোহার উনুন ঝাপসা দেখা যায়। বন্দির ঘরের দরজায় সিলমোহর যেমন ছিল তেমনি রয়েছে।

দেশলাইয়ের কাঠিটা নিভে গেলে উত্তেজনায় কাঁপতে-কাঁপতে তিনি সেই ছোট্ট জানলাটার ভিতর দিয়ে উঁকি মারলেন। বন্দির ঘরে একটা মোমবাতি টিমটিম করে জ্বলছে। বন্দি বসে একটা টেবিলের সামনে। চোখে পড়ে শুধু তার পিঠের উপরকার ছড়িয়ে পড়া চুল আর হাত দুটো। চেয়ার, টেবিল আর গালচের উপর ছড়িয়ে রয়েছে নানা খোলা বই। পাঁচ মিনিট কেটে গেলো। বন্দি নড়লো না। পনেরো বছরের বন্দিদশা স্তব্ধ হয়ে বসে থাকতে তাকে শিখিয়েছে। মহাজন জানালায় টোকা দিলেন। বন্দি নড়লো না। সন্তর্পণে মহাজন দরজার সিলমোহর ছিঁড়ে তালায় চাবি লাগালেন। মরচে পড়া তালা থেকে একটা চাপা আর্তনাদ শোনা গেলো, দরজাটা উঠলো ক্যাঁচ-ক্যাঁচ করে। মহাজন ভেবেছিলেন একটা উত্তেজিত চিৎকার শুনতে পাবেন, শুনতে পাবেন পায়ের শব্দ। তিন মিনিট কেটে গেল, কিন্তু আগের মতোই ঘরের ভিতর চুপচাপ। তিনি ঘরে ঢুকলেন।

টেবিলের সামনে একটি লোক বসে। সাধারণ লোকের সঙ্গে তার চেহারায় কোনো মিল নেই। যেন একটি কঙ্কাল বসে রয়েছে। হাড়ের উপরকার চামড়া টানটান, মাথায় মেয়েদের মতো কোঁকড়ানো কালো চুল, লম্বা ময়লা দাড়ি। মুখের রং হলদেটে, গাল বসা। যে হাত ঝাঁকড়া চুল-ভরতি মাথা ধরে রেখেছে সেটা এমন অস্থিচর্মসার যে দেখলে কষ্ট হয়। চুল পেকে গেছে। এই শুকনো বুড়োটে মুখের দিকে চাইলে কেউই বিশ্বাসই করবে না তার বয়েস সাতচল্লিশ। টেবিলের উপর তার মুখটা ঝুঁকে পড়েছে, সামনে একটা কাগজ। তাতে খুদে-খুদে অক্ষরে কী সব যেন লেখা।

মহাজন ভাবল, ‘বেচারা ঘুমিয়ে খুব সম্ভব লাখ-বেলাখের স্বপ্ন দেখছে। এই আধমরা শরীরটাকে বিছানায় পেড়ে মুখে একটা বালিশ চেপে ধরলেই কাজ হাসিল। খুঁটিয়ে পরীক্ষা করলেও অস্বাভাবিক মৃত্যু বলে কেউ সন্দেহ করতে পারবে না। কিন্তু প্রথমে দেখা যাক লোকটা কী লিখেছে।’

টেবিল থেকে কাগজটা তুলে তিনি পড়তে লাগলেন :

‘কাল রাত বারোটায় আমি মুক্তি পাব। মানুষের সঙ্গে মেশবার অধিকার পাব। কিন্তু এই ঘর থেকে বেরিয়ে সূর্যের মুখ দর্শনের আগে কয়েকটা কথা আপনাকে বলা দরকার বলে মনে করি। ঈশ্বরের নামে শপথ করে অন্তর থেকে বলছি স্বাধীনতা, জীবন, স্বাস্থ্য ইত্যাদি সম্বন্ধে বইতে যেসব গালভরা কথা লেখা আছে—সেগুলোকে আমি ঘেন্না করি।

পনেরো বছর ধরে কঠোর পরিশ্রম করে আমি পার্থিব জীবনের সবদিক খুঁটিয়ে বিচার করে দেখেছি। এ-কথা অবশ্য সত্যি যে, এই সময়ের মধ্যে আমি না দেখেছি পৃথিবী, না মানুষ। আপনাদের বই থেকে আমি পান করেছি সুগন্ধি মদ, গান গেয়েছি, বনে-বনে হরিণ-শুয়োর শিকার করেছি। আপনাদের বই-এর মধ্যে দিয়ে আমি এলব্রুজ আর মঁ ব্লাঁ পাহাড়ের চুড়োয় উঠেছি। সেখান থেকে দেখেছি সকালের সূর্যোদয় আর বিকালের সূর্যাস্তের সোনা আকাশে, সমুদ্রে আর পাহাড়ে উপচে পড়তে। দেখেছি মাথার উপরকার মেঘে-মেঘে বিদ্যুৎ ঝলসাতে। দেখেছি নানা সবুজ বন, মাঠ, নদী, হ্রদ, শহর। শুনেছি সাইরেনদের গান, প্যানের বাঁশি। সুন্দর-সুন্দর দেবদূতের ডানা আমি ছুঁয়েছি, যারা উড়ে-উড়ে আমার কাছে এসেছে ঈশ্বরের কথা শোনাতে। আপনাদের বই থেকে আমি ঝাঁপ দিয়েছি অতল গভীরে, করেছি অসাধ্য সাধন, পুড়িয়ে ছাই করেছি বহু শহর, প্রচার করেছি নতুন-নতুন ধর্ম, বিজয় করেছি দেশের পর দেশ...

আপনাদের বই থেকে আমি গভীর জ্ঞান লাভ করেছি। মানুষের বহু শতাব্দীর ধ্যান-ধারণা আমার খুলির মধ্যে ছোট্ট একটা দলা পাকিয়ে রয়েছে। আমি জানি আপনাদের সবাইকার চেয়ে আমার বিদ্যা-বুদ্ধি বেশি।

কিন্তু শুনুন—আপনাদের বইতে আমার ঘেন্না; পার্থিব সুখ, পার্থিব জ্ঞানে আমার ঘেন্না। সবটাই শূন্য ক্ষণভঙ্গুর—মরীচিকার মতো মায়া। গর্বে আপনারা বুক ফোলাতে পারেন, হতে পারেন আপনারা বিজ্ঞ আর সুন্দর। কিন্তু গর্তের মধ্যেকার ইঁদুরের মতোই মৃত্যু আপনাদের পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেবে। পৃথিবীর সঙ্গে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে আপনাদের বংশধর, আপনাদের প্রতিভাবান পুরুষদের অমরত্ব।

সবাই আপনারা উন্মাদ। চলেছেন ভুল পথে। মিথ্যেকে আপনারা সত্যি বলে মনে করেন, কদর্যতাকে মনে করেন সুন্দর। আপেল আর কমলালেবু গাছে হঠাৎ ব্যাং আর গিরগিটি ফললে কিংবা গোলাপ থেকে ঘোড়ার ঘামের গন্ধ ছাড়লে আপনারা অবাক হবেন। সেইরকম আপনাদের দেখে আমি অবাক হচ্ছি, যাঁরা স্বর্গের বিনিময়ে পৃথিবীকে নিয়েছেন। আপনাদের বুঝতে আমি চাই না।

আপনাদের যেটা পরম কাম্য তার প্রতি আমার চরম বিতৃষ্ণা প্রমাণ করার জন্যে কুড়ি লাখের বাজি আমি রেখে দিলাম। একসময় ভেবেছি ওই কুড়ি লাখ বুঝি স্বর্গ। এখন ওই কুড়ি লাখে আমার ঘেন্না। বাজি হারবার জন্যে নির্দিষ্ট সময়ের আগেই এখান থেকে বেরিয়ে আসবো।'

পড়া হলে কাগজটা টেবিলে রেখে এই মানুষটির মস্তক চুম্বন করে মহাজন কাঁদতে লাগলেন। সেখান থেকে বেরিয়ে যাবার সময় নিজের উপর তাঁর এমন অশ্রদ্ধা হলো, জীবনে আগে কখনও যা হয়নি—ফাটকা বাজারে দারুণ মার খাবার পরেও এ-রকম কষ্ট তিনি পাননি। বাড়ি ফিরে বিছানায় তিনি গা ঢেলে দিলেন। কিন্তু উত্তেজনা আর কান্নার দরুন অনেকক্ষণ তাঁর ঘুম এল না...

পরের দিন সকালে চৌকিদার হাঁপাতে-হাঁপাতে এসে তাঁকে জানাল বন্দিকে সে দেখেছে জানলা গলে বাগানে নেমে ফটক দিয়ে উধাও হয়ে যেতে। সঙ্গে সঙ্গে মহাজন চাকর-বাকর নিয়ে সেখানে হাজির হলেন। তাদের সামনে তিনি প্রমাণ করলেন বন্দি পালিয়েছে। অনর্থক গুজব এড়াবার জন্যে নির্বিকার চিত্তে টেবিল থেকে কাগজটা নিয়ে তিনি সেটা তাঁর সিন্দুকে রাখলেন বন্ধ করে।

(সম্পাদিত)

নাটক

প্রতাপাদিত্য

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ

আগ্রা—বাদশার কক্ষ

আকবর ও সেলিম

সেলিম। জাঁহাপনা! এ গোলামকে তলব করেছেন কেন?

আকবর। বিশেষ প্রয়োজনে তোমাকে আজ আনিয়েছি। সঙ্গে কেউ আছে?

সেলিম। আজ্ঞে, গোলাম একা জাঁহাপনা!

আকবর। দরজা বন্ধ করো। তারপর শোনো—যা বলি, তা মন দিয়ে শোনো।—আমার শারীরিক অবস্থা দেখতে পাচ্ছ?

সেলিম। জাঁহাপনার শারীরিক ও মানসিক—দুই অবস্থাই খারাপ।

আকবর। শারীরিক যত, মানসিক তার চেয়ে শতগুণ বেশি। বাংলায় কী ব্যাপার হচ্ছে, তা জানো?

সেলিম। শুনেছি—বাংলায় একটা ক্ষুদ্র ভূম্যধিকারী বিদ্রোহী হয়েছে।

আকবর। হাঁ, ব্যাপারটা এইরূপই বলে আগ্রায় প্রচার।

আর এই ভুঁইয়ার বিদ্রোহ ভিন্ন অন্য কোনো নামে একথা হিন্দুস্থানে প্রচার করতে দেব না। আর মোগল রাজত্বের ইতিহাসে এ সংবাদের একটিমাত্র অক্ষরও উদ্ধৃত হবে না। তা পরাজিত হই, কী জয়ীই হই।

সেলিম। একটা তুচ্ছ বাঙালি ভুঁইয়ার বিদ্রোহে যে হিন্দুস্থানের বাদশা এতদূর চিন্তিত, এটা আমি বিশ্বাস করতে পারি না।

আকবর। হিন্দুস্থানের বাদশা কি সামান্য কারণেই এতদূর চিন্তিত! সেলিম এ ভুঁইয়ার বিদ্রোহ নয়।

সেলিম। তবে কী জাঁহাপনা?

আকবর। বাঙালিকে দেখেছ?

সেলিম। দেখেছি, বড়ো বুদ্ধিমান। কিন্তু শরীর সম্বন্ধেই কী, আর মন সম্বন্ধেই বা কী—বড়ো দুর্বল। শান্ত, শিষ্ট, ধীর, মিষ্টভাষী, প্রেমপূর্ণ প্রাণ—কিন্তু বড়ো দুর্বল—দুর্বলতার জন্য বাঙালিতে একতা নেই—বাঙালিতে সত্যনিষ্ঠার অভাব, —বাঙালি পরচ্ছিদ্রান্বেষী, পরশ্রীকাতর, স্বার্থপর। একা বাঙালি মহাশক্তি—জ্ঞানে, বিদ্যায়, বুদ্ধিমত্তায়, বাক্‌পটুতায়, কার্যতৎপরতায় বাঙালি জগতে অদ্বিতীয়,—মহাশক্তিমান সম্রাটেরও পূজনীয়। কিন্তু একত্র দশ বাঙালি অতি তুচ্ছ—হীন হতেও হীন। অন্য জাতির দশে কার্য, বাঙালির দশে কার্যহানি।

আকবর। কিন্তু বাঙালি নিজের দুর্বলতা বোঝে—এটা জানো? আর বুঝে যদি কার্য করে, তাহলে বাঙালি কী হতে পারে, তা জানো?

সেলিম। গোস্তাকি মাফ হয় জাঁহাপনা—ওইটেতেই আমার কিছু সন্দেহ আছে।

আকবর। আগে আমারও ছিল, কিন্তু এখন আর নেই! বাঙালিতে একতা এসেছে। বাঙালি একটা জাতি হয়েছে! বাংলার বিদ্রোহ—তুচ্ছ ভুঁইয়ার বিদ্রোহ নয়। সাত কোটি বাঙালির বিশাল জাতীয় অভ্যুত্থান। বলো দেখি সেলিম! হিন্দুস্থানের বাদশার তাতে চিন্তার কারণ আছে কি না?

সেলিম। অবশ্য আছে। কিন্তু এরূপ অসম্ভব ব্যাপার কেমন করে সংঘটিত হল জাঁহাপনা?

আকবর। অত্যাচার! একমাত্র কারণ অত্যাচার! নিরীহ, শান্তিপ্রিয়, রাজভক্ত প্রজা, আজ অত্যাচারে উত্তেজিত হয়েছে। আমার নরাধম কর্মচারীগণ, বাঙালি চরিত্রের বিকৃত চিত্র আমার সম্মুখে উপস্থিত করত। অত্যাচারে উৎপীড়িত হয়ে প্রজা যখন আমার কাছে প্রতিকারের জন্য উপস্থিত হত, তখন কুলাঙ্গার আর কতকগুলো বাঙালির সহায়তায়, আমার কর্মচারী আমাকে বিপরীতভাবে বুঝিয়ে যেত। আমি কিছু বুঝতে না পেরে কর্মচারীর কথায় বিশ্বাস করে প্রতিকারে অক্ষম হয়েছি! কখনো-কখনো অত্যাচারের কথা, আমার কানের কাছে আসতে আসতে পথেই মিলিয়ে গেছে। নিরুপায় প্রজা বহুদিন নীরবে অত্যাচার সহ্য করেছে। কিন্তু সহিষ্ণুতারও একটা সীমা আছে। আজ বাঙালি সেই সীমা অতিক্রম করেছে। প্রতিকারের জন্য একত্র হতে গিয়ে একজন মহাশক্তিমান যুবকের কৌশলে তারা আজ একটা মহান জাতীয় জীবনে উল্লসিত।

সেলিম। সে ব্যক্তি কে জাঁহাপনা?

আকবর। তুমি তাকে দেখেছ—তুমি তার সঙ্গে বন্ধুতা করেছ, তার প্রকৃতিতে মুগ্ধ হয়ে তার উন্নতি কামনায় তুমিই আমাকে অনুরোধ করেছ।

সেলিম। কে—প্রতাপ-আদিত্য?

আকবর। প্রতাপ-আদিত্য। আমিও তার আচরণে মুগ্ধ হয়ে তাকে যশোরের আধিপত্য প্রদান করেছি। সে এককথায় আমাকে বশীভূত করে রাজ্য পুরস্কার পেয়েছে। আমায় দেখে—আমার মুখের পানে এক দৃষ্টিতে চেয়ে,

সে আমাকে বলেছিল, 'জাঁহাপনা! আজও আপনি দুনিয়া জয় করতে পারেননি!' বিস্ময়ে আমি তার মুখের দিকে চাইলুম। দেখলুম—সেই উজ্জ্বল পলকহীন বিশাল চক্ষু আমার দৃষ্টিপথ ভেদ করে হৃদয়মধ্যস্থ শক্তির ভাণ্ডার অন্বেষণ করছে। আমি রহস্য করে জিজ্ঞাসা করলুম। —'প্রতাপ! কিছু খুঁজে পেলে?' যুবক বললে—'জাঁহাপনা! পেয়েছি। রাশি রাশি স্তূপীকৃত অতুলনীয় শক্তি। কিন্তু সম্রাট আকবরের শক্তির তুলনায় তাঁর জীবনের পরিমাণ অতি ক্ষুদ্র! নইলে পাঁচজন মোগল নিয়ে যে ব্যক্তি ভারত আয়ত্ত করেছে, সে মহাপুরুষ পঞ্চাশজন ভারতবাসী নিয়ে কি পৃথিবী জয় করতে পারে না! পারে, কিন্তু ঈশ্বর আকবরকে শতবর্ষব্যাপী যৌবন দান করেননি। প্রিয়দর্শন দিল্লিশ্বরের মুখে আজ বার্ধক্যের ম্লান রেখা। তাই, সময়ের অভাবে তিনি আজ কেবল ভারত নিয়েই সন্তুষ্ট!' আমি বললুম—'তুমি পার?' প্রতাপ বললে—'বোধ হয়।' আমি কৌতূহলপরবশ হয়ে পরীক্ষার জন্যে তাকে যশোর প্রদান করি। অল্পদিনের মধ্যে সেই যশোর বেহার পর্যন্ত ব্যাপ্ত হয়েছে। আর যদি এক পদ অগ্রসর হয়—কোনোক্রমে বাংলা যদি বারাণসীর এপারে এসে পড়ে তা হলে মোগলের হাত থেকে ভারত গিয়েছে জেনে রাখো। আমার শরীরের অবস্থায় বুঝতে পারছি, আমি আর অধিক দিন বাঁচব না। এ কার্য তোমাকেই করতে হবে! কাবুল যাক, গোলকুণ্ডা যাক, আমেদনগর যাক—দিল্লি বাদে ভারতের অধিকৃত সাম্রাজ্য সব যাক, একদিন না একদিন ফিরে পাবে। কিন্তু বাংলা বারাণসীর পারে যদি অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ স্থানও অগ্রসর হয়, তাহলে মোগল সাম্রাজ্য আর ফিরে পাবে না। পাঁচজন মোগল নিয়ে ভারতশাসন। মানসিংহ, বীরবল, ভগবানদাস, টোডরমল প্রভৃতি মলিন দর্পণে প্রতিফলিত হয়ে এই পাঁচজন মোগল পাঁচ কোটির আবছায়া ধারণ করে আছে। এ দর্প না ভাঙতে ভাঙতে শীঘ্র যাও। যত শীঘ্র পারো, প্রতাপের গতিরোধ করো।

সেলিম। জাঁহাপনা কী গতিরোধের চেষ্টা করেননি?

আকবর। করেছি। কিন্তু আজও পর্যন্ত কিছু করতে পারিনি। শের খাঁ গেছে, ইব্রাহিম পরাস্ত হয়ে পালিয়ে এসেছে। শেষে আজিম খাঁকে বাইশ আমির সঙ্গে দিয়ে লক্ষ সৈন্যের অধিনায়ক করে পাঠিয়েছি। কিন্তু আজও তো জয়ের সংবাদ কেউ আনলে না! (নেপথ্যে করাঘাত) কে ও?

সেলিম কর্তৃক দ্বারোন্মোচন ও দূতের প্রবেশ

আকবর। খবর?

দূত। জাঁহাপনা! বলতে গোলামের মুখে কথা আসছে না।

আকবর। বুঝতে পেরেছি—আজিমও হেরেছে।

দূত। শুধু হার নয় জাঁহাপনা! —সব গেছে!

সেলিম। সব গেছে!

দূত। আজিম খাঁ মারা গেছেন, বাইশ আমিরের একজনও নেই। পঞ্চাশ হাজার ফৌজ ধ্বংস। বিশ হাজার বন্দি। বাকি আছে কী গেছে, তার খবর নেই।

আকবর। সেলিম! এরূপ যুদ্ধের খবর আর কখনও কি শুনেছ? এক লক্ষ সৈন্য সব শেষ! সেলিম! শীঘ্র যাও—এই পাঞ্জাযুক্ত হুকুম নাও। মানসিংহ কাবুল যাচ্ছে, পথ থেকে তাকে ফিরিয়ে আনো। সমস্ত সাম্রাজ্যের ভারে যশোরের ওপর চেপে পড়ো। মুহূর্তমাত্র বিলম্ব কোরো না। সেলিম! এ পরাজয় নয়, আমার মৃত্যু। কিন্তু আমার পানে চেয়ো না, আমার মৃত্যুর অপেক্ষা কোরো না। জলদি যাও—জলদি যাও। এ পরাজয়সংবাদ হিন্দুস্থানে রাষ্ট্র হবার পূর্বে মানসিংহের সঙ্গে বাংলায় সৈন্য প্রেরণ করো।

(সংক্ষেপিত)

লেখক পরিচিতি

[লেখকদের নাম বর্ণানুক্রমিকভাবে সাজানো হয়েছে]

অক্ষয়চন্দ্র সরকার (১৮৪৬ — ১৯১৭) : জন্ম হুগলি জেলার চুঁচুড়ায়। পিতা সাহিত্যিক ও কবি গঙ্গাচরণ সরকার। আইনজীবী অক্ষয়চন্দ্র অল্প বয়স থেকেই বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত *বঙ্গদর্শন* পত্রিকায় লেখালেখি শুরু করেন। ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি *সাধারণী* নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। তিনি নবজীবন পত্রিকারও প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। যুক্তবর্ণ বিহীন শিশুপাঠ্য কাব্যগ্রন্থ *গোচারণের মাঠ* তাঁর বিখ্যাত রচনা। অক্ষয়চন্দ্র রচিত অন্যান্য গ্রন্থ— *কবি হেমচন্দ্র, মহাপূজা, সনাতনী, সংক্ষিপ্ত রামায়ণ, রূপক* ও *রহস্য* প্রভৃতি।

অনুপমা বসুমাতরি (জন্ম: ১৯৬০): জন্ম অসমের গোয়ালপাড়া। অসমিয়া ভাষায় কবিতা লেখেন। সমকালীন বিশিষ্ট মহিলা কবি হিসেবে স্বীকৃত। প্রথম কাব্যগ্রন্থ *রূপালি রাতির ঘাট*, অন্যান্য কাব্যগ্রন্থের মধ্যে বিশেষ উল্লেখ্য *অনুভূতির বিষন্ন প্রান্তর, দুখ আরু প্রেমর মোহনাত, জাকারান্দা ভরা এক রাতি, সিয়াং সীমান্তর বটাহর অর্কেস্ট্রা, প্রেমর ইমপ্রেশনিস্ট ল্যান্ডস্কেপ* প্রভৃতি। অনুবাদ করেছেন কোরিয়ান কবিতার সংকলন, *শীতর রাতির অনুরাগ* এবং খলিল জিব্রানের *বলুকা মরমর আখর*। ভ্রমণকাহিনির মধ্যে রয়েছে, *চিন দেশর মধুর স্মৃতি স্মরি* এবং *ভারতর পর ব্রিটেন অলই : এক আন্তরিক যাত্রা*।

আন্তন চেকভ (১৮৬০ — ১৯০৪) : দক্ষিণ রাশিয়ার বন্দর শহর ট্যাগানরগে (Taganrog) জন্ম। পিতার নাম পাভেল ইয়েগোরোভিচ চেকভ। শৈশব থেকেই সাহিত্যের প্রতি আকর্ষণ ছিল। আধুনিক ছোটো গল্পের ইতিহাসে নবজাগরণের সূচনা করেছিলেন। প্রায় দুই শতাধিক ছোটো গল্পের রচয়িতা। তাঁর ছোটো গল্পগুলির মধ্যে *দি হাজব্যান্ড, দি স্কুল মাস্টার, দি প্রিন্সেস, এ হ্যাপি ম্যান, দি শ্যু মেকার অ্যান্ড দি ডেভিল, দি ব্ল্যাক মঙ্ক* ও *মাই লাইফ* ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। নাট্যকার হিসেবেও তিনি খ্যাতি পেয়েছিলেন। তাঁর বিখ্যাত নাটকগুলির মধ্যে *দি সিগাল, থ্রি সিসটারস, দি চেরি অরচার্ড* উল্লেখযোগ্য। পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় তাঁর রচনা অনূদিত হয়েছে। তিনি ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে *পুশকিন* পুরস্কার লাভ করেন।

আশাপূর্ণা দেবী (১৯০৯—১৯৯৫) : অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাঙালি লেখিকা। জন্ম কলকাতায়। স্কুল-কলেজে পড়ার সুযোগ ঘটেনি। অথচ অসামান্য সূক্ষ্ম দৃষ্টি, সংবেদনশীলতা ও পরিচিত সমাজের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তিনি বাঙালি মধ্যবিত্ত জীবনকে আশ্চর্য দক্ষতায় তার গল্প-উপন্যাসে তুলে ধরেছিলেন। তিনি দীর্ঘ জীবনে অসংখ্য উপন্যাস, গল্প এবং ছোটোদের জন্য অজস্র বই লিখেছেন। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য — *ছোট ঠাকুরদার কাশীযাত্রা, প্রথম প্রতিশ্রুতি, সুবর্ণলতা, বকুলকথা, অগ্নিপরীক্ষা, সাগর শুকায়ে যায়, শশীবাবুর সংসার, সোনার হরিণ* ইত্যাদি। তাঁর রচিত অন্তত ৬৩টি গ্রন্থ বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে। তিনি *রবীন্দ্র পুরস্কার, সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার, লীলা পুরস্কার, জ্ঞানপীঠ পুরস্কার*, একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি. লিট্ এবং নানা সরকারি খেতাবে ভূষিত হয়েছেন।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০—১৮৯১) : জন্ম মেদিনীপুরের বীরসিংহ গ্রামে। বাল্যকাল থেকেই অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। সংস্কৃত কলেজ থেকে *বিদ্যাসাগর* উপাধি লাভ করেন। পরবর্তীকালে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হন। শিক্ষাবিস্তার, স্ত্রী-শিক্ষার প্রসার ছাড়াও বিধবাবিবাহ প্রচলন, বহুবিবাহ-রোধ ইত্যাদি বহুবিধ সমাজ-সংস্কারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁর রচিত মৌলিক ও অনূদিত বহু গ্রন্থের মধ্যে *আখ্যানমঞ্জরী, বোধোদয়, ঋজুপাঠ, কথামালা , বর্ণপরিচয়, বেতাল পঞ্চবিংশতি, শকুন্তলা, সীতার বনবাস, ভ্রান্তিবিলাস, সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব, প্রভাবতী সম্ভাষণ* উল্লেখযোগ্য।

কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯—১৯৭৬) : কাজী নজরুল ইসলাম বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম কাজী ফকির আহমেদ। ১৩২৬ বঙ্গাব্দে *বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য* নামক পত্রিকায় তাঁর প্রথম কবিতা *মুক্তি* প্রকাশিত হয়। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে *বিজলী* পত্রিকায় *বিদ্রোহী* কবিতা প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র বাংলায় আলোড়ন সৃষ্টি হয়। কবি তাঁর কবিতায় কেবল ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ নয়, সমস্ত অন্যায় অবিচার ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন। তাঁর রচিত বইগুলো হলো — *অগ্নিবীণা, বিষের বাঁশি, সাম্যবাদী, সর্বহারা, ফণীমনসা, প্রলয়শিখা*।

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ (১৮৬৩ — ১৯২৭) : জন্ম ২৪ পরগনার খড়দহে। পিতা গুরুচরণ ভট্টাচার্য। প্রখ্যাত এই নাট্যকার মেট্রোপলিটান ইন্সটিটিউশন ও প্রেসিডেন্সি কলেজে শিক্ষালাভ করে ১৮৯২ থেকে ১৯০৩ খ্রি পর্যন্ত অধ্যাপনা করেন। ছাত্রাবস্থা থেকেই তিনি সাহিত্যচর্চা করেন। তাঁর রচিত বিভিন্ন মঞ্চসফল নাটকগুলির মধ্যে রয়েছে *আলিবাবা, রঘুবীর, বঙ্গের প্রতাপাদিত্য, আলমগীর, নন্দকুমার, ভীষ্ম, নরনারায়ণ* প্রভৃতি। নাটক ছাড়াও তিনি কিছু ছোটোগল্প ও উপন্যাস রচনা করেন। *অলৌকিক রহস্য* নামে একটি মাসিক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন ক্ষীরোদপ্রসাদ।

জসীমউদ্দীন (১৯০৪—১৯৭৬) : পল্লিকবি হিসেবে সমধিক প্রসিদ্ধ এই কবির জন্ম অধুনা বাংলাদেশের ফরিদপুরে। *নক্সীকাঁথার মাঠ, রাখালী, বালুচর, ধানক্ষেত, সোজনবাদিয়ার ঘাট* তাঁর অমর সৃষ্টি। *বেদের মেয়ে* শীর্ষক গীতিনাট্য, *চলে মুসাফির* নামক ভ্রমণ কাহিনি ও *ঠাকুরবাড়ির আঙিনায়* গ্রন্থরচনায় তাঁর সাহিত্য প্রতিভার অনন্যতা ধরা পড়েছে। পাঠ্যাংশটি তাঁর *সোজনবাদিয়ার ঘাট* কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে।

জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯—১৯৫৪) : রবীন্দ্র পরবর্তী বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এই কবির জন্ম অধুনা বাংলাদেশের বরিশালে। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ *ঝরাপালক* ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। অন্যান্য কাব্যগ্রন্থের মধ্যে রয়েছে - *ধূসর পাণ্ডুলিপি, বনলতা সেন, মহাপৃথিবী, সাতটি তারার তিমির, রূপসী বাংলা, বেলা অবেলা কালবেলা* প্রভৃতি। তাঁর রচিত আখ্যানের মধ্যে রয়েছে — *মাল্যবান, সুতীর্থ, জলপাইহাটি* প্রভৃতি। পাঠ্য কবিতাটি তাঁর 'রূপসী বাংলা' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত।

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় (১৮৪৭ — ১৯১৯) : জন্ম ২৪ পরগনার রাহুতা গ্রামে। পিতা বিশ্বম্ভর মুখোপাধ্যায়। লেখাপড়া করেছেন চুঁচুড়ার ডাফ সাহেবের স্কুল ও তেলিনীপাড়া স্কুলে। সাংসারিক অস্বাচ্ছন্দ্যের কারণে তিনি ঘুরে ঘুরে নানা স্থানে শিক্ষকতা করেন। কটকে থাকার সময় শেখেন ওড়িয়া ভাষাও। সেসময় *উৎকল শুভকরী* নামে ওড়িয়া ভাষায় একটি মাসিক পত্র সম্পাদনা করেন। পরবর্তীকালে কলকাতায় বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে কেরানির চাকরি করেছেন। পালন করেছেন কলিকাতা মিউজিয়ামের সহকারী কিউরেটরের দায়িত্বও। সারাজীবন বিভিন্ন পেশায় যুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ শেষ অবধি নিজেকে একজন সাহিত্যিক হিসেবেই প্রতিষ্ঠিত করেন। ইউরোপের নানা স্থানে ভ্রমণ করে *A visit to Europe* গ্রন্থ এবং মিউজিয়ামে চাকরি করার সময় সরকারি আনুকূল্যে *Art manufactures of India* গ্রন্থটি রচনা করেন। ত্রৈলোক্যনাথ বাংলা সাহিত্যে অজ্ঞাতপূর্ব এক উদ্ভট হাস্যরসের প্রবর্তক। তাঁর রচিত বিখ্যাত গ্রন্থগুলি হলো— *কঙ্কাবতী, ভূত ও মানুষ, ফোকলা দিগম্বর, মুক্তমালা, ডমরুচরিত* প্রভৃতি।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩ — ১৯১৩) : বাংলা সাহিত্যের নামকরা নাট্যকার হলেও দ্বিজেন্দ্রলালের প্রথম পরিচয় কবি হিসাবে। মাত্র উনিশ বছর বয়সে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ *আর্য্যগাথা* (১ম ভাগ)। কবি রচিত অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থগুলি হলো— *আর্য্যগাথা* (২য় ভাগ), *মন্দ্র, আষাঢ়ে, আলেখ্য, ত্রিবেণী* ইত্যাদি। দ্বিজেন্দ্রলালের কবি প্রতিভার প্রশংসা করেছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। দ্বিজেন্দ্রলাল ছন্দ নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন, তিনি মানুষের মুখের ভাষাকে ছন্দে প্রয়োগ করেছেন। তিনি অনেক হাসির কবিতা রচনা করেছেন। *দ্বিজেন্দ্রগীতি* হিসেবে পরিচিত তাঁর গানগুলি আজও বাঙালিজীবনে সমাদৃত। কবি দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতার মূল সুর স্বদেশপ্রেম।

প্রফুল্লচন্দ্র রায় (১৮৬১ — ১৯৪৪) : জন্ম যশোরের রাড়ুলি গ্রামে। পিতা হরিশচন্দ্র রায়। প্রখ্যাত রসায়নবিদ ও অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র ভারতবর্ষে রাসায়নিক শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রথম ভারতীয় প্রতিস্থাপক। পড়াশোনা করেছেন কলকাতার অ্যালবার্ট স্কুল, মেট্রোপলিটান স্কুল ও প্রেসিডেন্সি কলেজে। ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে রসায়নশাস্ত্রে মৌলিক গবেষণার জন্য এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে *ডি. এস সি. ডিগ্রি* ও বিশ্ববিদ্যালয়ের *হোপ* পুরস্কার লাভ করেন। ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে প্রেসিডেন্সি কলেজের রসায়নবিজ্ঞানে সহকারী অধ্যাপক রূপে নিযুক্ত হন। পরে ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে প্রধান অধ্যাপকের সম্মান অর্জন করেন। ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে তিনি *বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিমিটেড* প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলাদেশে বিবিধ শিল্পোন্নতি বিধানে এবং ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারের চেষ্টায় তাঁর অদম্য উৎসাহ ছিল। একইসঙ্গো বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চা প্রবর্তনে তিনি একজন প্রধান

উদ্যোক্তা। তাঁর রচিত আত্মচরিত *Life and Experiences of a Bengali Chemist* এবং ইংরাজি ও বাংলা ভাষায় রচিত বহু প্রবন্ধ তাঁর সাহিত্য সাধনার পরিচায়ক। *History of Hindu Chemistry*, *অন্ন সমস্যায় বাঙালির পরাজয় ও তাহার প্রতিকার*, *বাঙালির মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহার* ইত্যাদি তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪ — ১৯৫০) : জন্মস্থান বনগ্রাম, চব্বিশ পরগনা। তাঁর উল্লেখযোগ্য বই—*পথের পাঁচালী*, *আরণ্যক*, *অপরাজিত*, *ইছামতী*, *দেবযান*, *আদর্শ হিন্দু হোটেল*, *দৃষ্টিপ্রদীপ*, *কিন্নরদল* ইত্যাদি। কিশোরদের জন্য রচিত অভিযান বিষয়ক রচনা— *চাঁদের পাহাড়* প্রতিটি বাঙালির অবশ্যপাঠ্য। মৃত্যুর পরে ১৯৫১ সালে তাঁকে *রবীন্দ্র পুরস্কার* প্রদান করা হয়।

বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮—১৯৭৪) : কবি, ঔপন্যাসিক, ছোটোগল্পকার, নাট্যকার, প্রাবন্ধিক, শিশুসাহিত্যিক ও সমালোচক। সাহিত্যের সমস্ত শাখাতেই তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর মেলে। বুদ্ধদেব রচিত কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য *বন্দীর বন্দনা*, *কঙ্কাবতী*, *দ্রৌপদীর শাড়ি*, *যে আঁধার আলোর অধিক*, *শীতের প্রার্থনা: বসন্তের উত্তর*। তিনি *কবিতা* পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। শিশুদের জন্য লিখেছেন *কান্তিকুমারের পঞ্চকাণ্ড*, *ঘুমপাড়ানি*, *এলোমেলো* প্রভৃতি রচনা। রবীন্দ্রনাথের পরে এমন বহুমুখী প্রতিভা বাংলা সাহিত্যে বিরল।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪—১৮৭৩) : জন্ম অধুনা বাংলাদেশের যশোহর জেলার সাগরদাঁড়ি গ্রামে। বাল্যবয়সেই কলকাতায় এসে হিন্দু কলেজে ভর্তি হন। সেখানে তাঁর সহপাঠী ছিলেন ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রাজনারায়ণ বসু, গৌরদাস বসাক প্রমুখ। বিলেত যাওয়ার জন্য তিনি ধর্মান্তরিত হন। গ্রিক, ল্যাটিন, সংস্কৃত, ইংরেজি ভাষায় পাণ্ডিত্য অর্জন করলেও বাংলা ভাষায় পরবর্তীকালে দক্ষতা লাভ করেন। *রত্নাবলী*, *শর্মিষ্ঠা*, *একেই কি বলে সভ্যতা*, *পদ্মাবতী* ইত্যাদি নাটক এবং *মেঘনাদবধ কাব্য*, *তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য*, *চতুর্দশপদী কবিতা* ইত্যাদি তাঁর অসামান্য সৃষ্টি। *পদ্মাবতী* নাটকে তিনি প্রথম *অমিত্রাক্ষর ছন্দ* ব্যবহার করেন।

যতীন্দ্রমোহন বাগচী (১৮৭৮ - ১৯৪৮) : জন্ম হুগলি জেলার বলাগড়ে। পিতা হরিমোহন বাগচী। ডাফ কলেজ থেকে বি. এ. পাশ করেন। অল্প বয়সেই কবিতা রচনার সূত্রপাত, ভারতী, সাহিত্য প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর কবিতা প্রকাশিত হয়। সম্পাদনা করেছেন— *মানসী*, *যমুনা*, *পূর্বাচল* প্রভৃতি পত্রিকা। তাঁর লেখা উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলির মধ্যে রয়েছে— *রেখা*, *লেখা*, *অপরাজিতা*, *মহাভারতী*, *নাগকেশর*, *বন্ধুর দান*, *জাগরণী*, *পথের সাথী* প্রভৃতি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১—১৯৪১) : জন্ম কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে। অল্পবয়স থেকেই ঠাকুরবাড়ি থেকে প্রকাশিত *ভারতী* ও *বালক* পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন। *কথা ও কাহিনী*, *সহজপাঠ*, *রাজর্ষি*, *ছেলেবেলা*, *শিশু*, *শিশু ভোলানাথ*, *হাস্যকৌতুক*, *ডাকঘর*, *গল্পগুচ্ছ*'- সহ তাঁর বহু রচনাই শিশু-কিশোরদের আকৃষ্ট করে। দীর্ঘ জীবনে অজস্র কবিতা, গান, ছোটোগল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ লিখেছেন, ছবি এঁকেছেন। এশিয়ার মধ্যে তিনিই প্রথম *নোবেল* পুরস্কার পান ১৯১৩ সালে *Song Offerings*- এর জন্যে। দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র ভারত আর বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত তাঁর রচনা।

লীলা মজুমদার (১৯০৮-২০০৭) : জন্ম কলকাতায়, জ্যাঠামশাই উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর বাড়িতে। বাবা প্রমদারঞ্জন রায় *বনের খবর* বইয়ের লেখক। শৈশব কেটেছে শিলং পাহাড়ে। ১৯২০ সাল থেকে কলকাতায়। সারাজীবন সাহিত্যচর্চাই তাঁর সঙ্গী ছিল। প্রথম ছোটোদের বই *বদ্যিনাথের বড়ি*। অন্যান্য বিখ্যাত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ—*পদিপিসির বর্মিবাক্স*, *হলদে পাখির পালক*, *টং লিং*, *মাকু*। ছোটোদের জন্য প্রকাশিত *সন্দেশ* পত্রিকার যুগ্ম-সম্পাদক ছিলেন বহুকাল। বহু পুরস্কারে সম্মানিত—যার মধ্যে রয়েছে *রবীন্দ্র পুরস্কার*, *আনন্দ পুরস্কার*, *ভারতীয় শিশু সাহিত্যের পুরস্কার*।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬—১৯৩৮) : রবীন্দ্র সমসাময়িক ঔপন্যাসিকদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ। বর্ণময় জীবনের অধিকারী। তাঁর লেখায় জীবনের সেই অভিজ্ঞতার ছাপ স্পষ্ট। বাংলার গ্রাম-জীবন এবং মধ্যবিত্ত মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন-সম্ভাবনা

তাঁর গল্প উপন্যাসে আশ্চর্য মুন্সিয়ানায় ভাষারূপ পেয়েছে। তাঁর উপন্যাসগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য — *বড়দিদি, পল্লীসমাজ, দেবদাস, বিন্দুর ছেলে, রামের সুমতি, চরিত্রহীন, গৃহদাহ, শ্রীকান্ত, শেষ প্রশ্ন* প্রভৃতি। তাঁর লেখা ছোটোগল্পগুলির মধ্যে *লালু, মহেশ, অভাগীর স্বর্গ* ইত্যাদি পাঠক মহলে আজও সমাদৃত।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (১৯০১—১৯৭৬) : জন্ম রানীগঞ্জে, মাতুলালয়ে। বাল্যবন্ধুদের মধ্যে অন্যতম কাজী নজরুল ইসলাম। প্রথম লেখা *আত্মঘাতীর ডায়েরি* প্রকাশিত হয় *বাঁশরী* পত্রিকায়। *কালিকলম, ভারতবর্ষ, গল্পভারতী* প্রভৃতি পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি পুরস্কার লাভ করেন। তাঁর লেখা উপন্যাসের মধ্যে উল্লেখযোগ্য — *ঝড়ো হাওয়া, লক্ষ্মী, হাসি, বাংলার মেয়ে, কয়লাকুঠির দেশ, মহাযুদ্ধের ইতিহাস, খরস্রোতা, শহর থেকে দূরে* প্রভৃতি। তাঁর উল্লেখযোগ্য গল্পগ্রন্থগুলির মধ্যে রয়েছে — *অতসী, বধূবরণ, দিন-মজুর, ঠিক ঠিকানা, জীবন নদীর তীরে* প্রভৃতি।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২—১৯২২) : জন্মস্থান বর্ধমান জেলার চুপি গ্রাম। পিতা রজনীনাথ দত্ত এবং মাতামহ বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের অন্যতম পথিকৃৎ অক্ষয়কুমার দত্ত। রবীন্দ্র সমকালীন কবিদের মধ্যে অন্যতম জনপ্রিয় কবি। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থগুলি হলো — *সবিতা, সন্ধিক্ষণ, বেণু ও বীণা, ফুলের ফসল, কুহু ও কেকা, বেলাশেষের গান, বিদায় আরতি* প্রভৃতি এবং অনুবাদ কবিতা — *তীর্থসলিল, তীর্থরেণু, মণিমঞ্জুষা* প্রভৃতি। বাংলা সাহিত্যের জগতে কবি সত্যেন্দ্রনাথ *ছন্দের জাদুকর* নামে পরিচিত। *নবকুমার কবিরত্ন* ছদ্মনামে তিনি বেশ কয়েকটি ব্যঙ্গাত্মক কবিতা রচনা করেছেন।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় (১৯১৯—২০০৩) : বাংলা কবিতায় এক উল্লেখযোগ্য নাম কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়। ১৯৪০ সালে প্রকাশিত তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ *পদাতিক* প্রকাশিত হয়। তাঁর অন্যান্য কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে রয়েছে *অগ্নিকোণ, চিরকুট, ফুল ফুটুক, যত দূরেই যাই, কাল মধুমাস, ছেলে গেছে বনে, জল সইতে* প্রভৃতি। তিনি *হাফিজ, নাজিম হিকমত* ও *পাবলো নেরুদার* কবিতা অনুবাদ করেছেন। সাহিত্যে অবদানের জন্য তিনি *জ্ঞানপীঠ* পুরস্কার লাভ করেন। তাঁর গদ্য রচনার দৃষ্টান্ত *কাঁচা-পাকা, ঢোল গোবিন্দের আত্মদর্শন* প্রভৃতি গ্রন্থে ছড়িয়ে রয়েছে।

সৈয়দ মুজতবা আলী (১৯০৪—১৯৭৪) : জন্ম শ্রীহট্টের করিমগঞ্জে। বাবার নাম সৈয়দ সিকান্দর আলি। মহাত্মা গান্ধির ডাকে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে স্কুল ছাড়েন। শান্তিনিকেতনে পড়া শেষ করে তিনি কাবুলের শিক্ষাবিভাগে অধ্যাপক হন। তিনি আরবি, ফারসি, জার্মান সহ ১৫টি ভাষা জানতেন। প্রবন্ধ, ভ্রমণকাহিনি, উপন্যাস ও রম্য-রচনায় তাঁর দক্ষতা অসামান্য। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ *দেশে বিদেশে, পঞ্চতন্ত্র, চাচাকাহিনি, ময়ূরকণ্ঠী, শবনম, ধূপছায়া, টুনিমেম, হিটলার* প্রভৃতি। তিনি 'নরসিংহদাস পুরস্কারে' সম্মানিত।

প্রশ্নের কাঠামো ও নম্বর বিভাজন

	বহু বিকল্পীয় প্রশ্ন (MCQ)	অতি সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী (Very Short Answer Type)	ব্যাখ্যাভিত্তিক সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী (Short and Explanatory)	রচনাধর্মী প্রশ্ন (Essay Type)	পূর্ণমান (Total)
গল্প	০২	০৩	০৩	০৭	১৫
কবিতা	০২	০৩	০৩	০৭	১৫
প্রবন্ধ	০২	০৩	০৩	০৫	১৩
নাটক	০৩	০২	০৩	০৫	১৩
অনুবাদ (বাংলা থেকে ইংরাজি)	-	-	-	-	০৪
ব্যাকরণ	০৮	০৭	-	-	১৫
নির্মিতি	-	-	-	*১০+০৫	১৫

১০ নম্বরের প্রশ্নের জন্য : কম-বেশি ৩০০ শব্দ
০৭ নম্বরের প্রশ্নের জন্য : কম-বেশি ২০০ শব্দ
০৫ নম্বরের প্রশ্নের জন্য : কম-বেশি ১৫০ শব্দ
০৩ নম্বরের প্রশ্নের জন্য : কম-বেশি ৬০ শব্দ
০১ নম্বরের প্রশ্নের জন্য : কম-বেশি ১৫ শব্দ

* প্রবন্ধের প্রশ্নটির উত্তর প্রদান বাধ্যতামূলক।

নতুন প্রশ্নের কাঠামো অনুসারে নির্মিত নমুনা

বহু বিকল্পীয় প্রশ্ন প্রতি প্রশ্নের মান- ১

১। ঠিক বিকল্প উত্তরটিতে (✓) চিহ্ন দাও :

১.১. 'করিয়া রহিল মাথা হেঁট' — কে মাথা হেঁট করে রইল?

ক) সামন্ত জয়সেন গ) রত্নাকর শেঠ

খ) ধর্মপাল ঘ) অনাথপিণ্ডদসুতা

১.২. 'সে জননীর পদ অধিকার করিয়া বসিল', — কীভাবে জননীর পদ অধিকার করল?

ক) পথ্য খাইয়ে গ) কপালে হাত দিয়ে

খ) বৈদ্য ডেকে ঘ) আন্তরিক সেবা দিয়ে

২। অতি সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্ন (কম-বেশি ১৫টি শব্দের মধ্যে উত্তর লেখ) : প্রতি প্রশ্নের মান- ১

২.১. কী সুন্দর মালা আজি পরিয়াছ গলে : .... — কাকে উদ্দেশ্য করে উক্তিটি করা হয়েছে?

২.২. হা পুত্র! হা বীরবাহু ! বীরেন্দ্র - কেশরী! — বীরবাহু কে?

২.৩. কোন গুণে দাশরথি কিনেছে তোমারে? — 'দাশরথি' বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে?

৩। ব্যাখ্যাভিত্তিক সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী (কম - বেশি ৬০টি শব্দের মধ্যে উত্তর দাও) : প্রতি প্রশ্নের মান- ৩

৩.১. 'ভিক্ষা অন্নে বাঁচাব বসুধা' — বক্তা কেন ভিক্ষান্নের দ্বারা বসুধা বাঁচানোর সংকল্প গ্রহণ করেছেন?

৪। রচনাধর্মী প্রশ্ন — (কম-বেশি ২০০টি শব্দ ব্যবহার করতে হবে) : প্রতি প্রশ্নের মান- ৭

৪.১. 'দ্বিতীয় ভ্রান্তিপাশে পড়িবার জন্য চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠে।' — 'ভ্রান্তিপাশ' কী? 'ভ্রান্তিপাশ' জেনেও চিত্ত তাতে আবন্ধ হবার জন্য ব্যাকুল হয় কেন? ১ + ৬